কা হি নী

কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সাদর উৎসর্গ

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্য

মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর

-করকমলে

২০ ফাল্গুন

১৩০৬

সূচীপত্র

কাহিনী'র ১৩৬২ বঙ্গাব্দের মুদ্রণে 'পতিতা' ও 'ভাষা ও ছন্দ' এই দুটি কবিতাকে গ্রন্থের প্রথমে স্থান দিয়া নাট্য-কবিতাগুলি পরে সাজানো হয় এবং 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' -শীর্ষক কৌতুকনাট্য সর্বশেষে। এ বিষয়ে মুখ্যত: ১৯১৫ খৃস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চমখণ্ড কাব্য-গ্রন্থের অনুসরণ করা হইয়াছে।

পতিতা

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।
দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন,
দেবতা জাগিলে মোদের রাতি—
ধরার নরকসিংহদুয়ারে
জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি।
তুমি অমাত্য রাজসভাসদ্,
তোমার ব্যাবসা ঘৃণ্যতর,
সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া
মানুষের ফাঁদে মানুষ ধর!
আমি কি তোমার গুপ্ত অস্ত্র?
হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই?
ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই?
নাহিকো করম, লজ্জা শরম,
জানি নে জনমে সতীর প্রথা—

তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা!

সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন,
অদূরে সুনীল শৈলমালা,
কলগান করে পুণ্য তটিনী—
সে কি নগরীর নাট্যশালা!
মনে হল সেথা অন্তরগ্লানি
বুকের বাহিরে বাহিরি আসে।
ওগো বনভূমি, মোরে ঢাকো তুমি
নবনির্মল শ্যামল বাসে।
অয়ি উজ্জ্বল উদার আকাশ,
লজ্জিত জনে করুণা ক'রে
তোমার সহজ অমলতাখানি
শত পাকে ঘেরি পরাও মোরে।

স্থান আমাদের রুদ্ধ নিলয়ে
প্রদীপের-পীত-আলোক-জ্বালা,
যেথায় ব্যাকুল বদ্ধ বাতাস
ফেলে নিশ্বাস হুতাশ-ঢালা।
রতননিকরে কিরণ ঠিকরে,
মুকুতা ঝলকে অলকপাশে,

মদির শীকর-সিক্ত আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে।
মোরা গাঁথা মালা প্রমোদরাতের—
গেলে প্রভাতের পুষ্পবনে
লাজে ম্লান হয়ে মরে ঝরে যাই,
মিশাবারে চাই মাটির সনে।
তবু, তবু ওগো কুসুমভগিনী,
এবার বুঝিতে পেরেছি মনে,
ছিল ঢাকা সেই বনের গন্ধ
অগোচরে কোন্ প্রাণের কোণে।

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা,
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।
পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
পূর্ব-অচলে উষার মতো—
তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা,
জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎশত।
মনে হল, মোর নবজনমের
উদয়শৈল উজল করি
শিশিরধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি।

তরুণীরা মিলি তরণী বাহিয়া
পঞ্চম সুরে ধরিল গান—
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
মৃগশিশুসম পাতিল কান।
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে
মুনিবালকেরে ফেলিয়া ফাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি ঘিরিয়া ঘিরিয়া
নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।
নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদীজলতলে বাজিল শিলা—
ভগবান ভানু রক্তনয়নে
হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

প্রথমে চকিত দেবশিশুসম
চাহিলা কুমার কৌতূহলে—
কোথা হতে যেন অজানা আলোক
পড়িল তাঁহার পথের তলে।
দেখিতে দেখিতে ভক্তিকিরণ
দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে—
দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
হেরিলেন আজি প্রভাতকালে।
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি—

বন্দনাগান রচিলা কুমার
জোড় করি করকমল দুটি।
করুণ কিশোর কোকিলকণ্ঠে
সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তিমগন
পাতায় পাতায় শিহরি উঠে।
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয় নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্মলা উষা
নির্জনগিরিশিখর-'পরে।
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
নীলনির্বাক্ সিন্ধুতলে।
শুনে গ'লে যায় আর্দ্র হৃদয়
শিশিরশীতল অশ্রুজলে।

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
অঞ্চলতল অধরে চাপি।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক
ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।
ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি—
কহিনু, 'হে মোর প্রভু তপোধন,
চরণে আগত অধম দাসী।'

তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
মুছানু আপন পট্টবাসে—
জানু পাতি বসি যুগলচরণ
মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।
তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো—
তাপসকুমার চাহিলা আমার
মুখপানে করি বদন নত।
প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয়ভেরী।
ধন্য রে আমি, ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।
জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া,
কুমারীর নব নীরব প্রীতি—
আমার হৃদয়বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
‘কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা
তোমার পরশ অমৃত সরস,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।’

হেসো না মন্ত্রী, হেসো না, হেসো না,
ব্যথায় বিঁধো না ছুরির ধার—
ধূলিলুণ্ঠিতা অবমানিতারে
অবমান তুমি কোরো না আর।
মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনি নি এমন সত্যবাণী।
সত্য কথা এ, কহিনু আবার,
স্পর্ধা আমার কভু এ নহে—
ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না,
ঋষির রসনা মিছে না কহে।
বৃদ্ধ, বিষয়বিষজর্জর,
হেরিছ বিশ্ব দ্বিধার ভাবে,
নগরীর ধূলি লেগেছে নয়নে—
আমারে কি তুমি দেখিতে পাবে!
আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা—
অমৃতসরস আমার পরশ,
আমার নয়নে দিব্য বিভা।
আমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা,
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।

দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা—
দূরদুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।
সেইখানে এল আমার তাপস,
সেই পথহীন বিজন গেহ—
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
যেথা কোনোদিন আসে নি কেহ।
সাধকবিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকতপ্রাণে—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
'আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'
শুনি সে বচন, হেরি সে নয়ন,
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।

নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।
বহুদিন মোর প্রমোদনিশীথে
যত শত দীপ জলিয়াছিল,
দূর হতে দূরে, এক নিশ্বাসে
কে যেন সকলি নিবায়ে দিল।
প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন
সঁপি দিল কর আমার কেশে,
আপনার করি নিল পলকেই
মোরে তপোবন-পবন এসে।

মিথ্যা তোমার জটিল বুদ্ধি—
বৃদ্ধ, তোমার হাসিরে ধিক্।
চিত্ত তাহার আপনার কথা
আপন মর্মে ফিরায়ে নিক।
তোমার পামরী পাপিনীর দল
তারাও অমনি হাসিল হাসি—
আবেশে বিলাসে, ছলনায় পাশে
চারি দিক হতে ঘেরিল আসি।
বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি পড়ে কবরী টুটি—
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি হস্ত দুটি।

হে মোর অমল কিশোর তাপস,
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি !
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি।
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি দিতাম টানি
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত শরমখানি।
ও আহুতি তুমি নিয়ো না, নিয়ো না,
হে মোর অনল, তপের নিধি—
আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি !
ধিক্ রমণীরে, ধিক্ শতবার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক্ !
রমণীজাতির ধিক্কারগানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক।
ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্নলতিকাসমা
কহিনু তাপসে, 'পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা।
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি !'
হরিণীর মতো ছুটে চলে এনু
শরমের শর মর্মে বিঁধি।

কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে,
'আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি!'
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি।
ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবনতরু করুণা মানি,
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী—
'আনন্দময়ী মুরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'
দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করে নি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।
তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।

মন্ত্রী, আবার সেই বাঁকা হাসি?
নাহয় দেবতা আমাতে নাই—

মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা,
সাধকেরা পূজা করে তো তাই।
একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে
আর কি পূজিবে পৌরজন!
পূজা যদি মোর হয়ে থাকে শেষ
হয়ে গেছে শেষ আমার খেলা—
দেবতার লীলা করি সমাপন
জলে ঝাঁপ দিবে মাটির ঢেলা।
হাসো হাসো তুমি হে রাজমন্ত্রী,
লয়ে আপনার অহংকার—
ফিরে লও তব স্বর্ণমুদ্রা,
ফিরে লও তব পুরস্কার।
বহু কথা বৃথা বলেছি তোমায়,
তা লাগি হৃদয় ব্যথিছে মোরে,
অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ স্মরণ ক'রে—
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ,
দু-একটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।

১ কার্তিক ১৩০৪

ভাষা ও ছন্দ

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল,
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়, সেইমত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্‌বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি— রক্তবেগতরঙ্গিত-বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত
তারে লয়ে কী করিবে, ভাবে মুনি কী তার উদ্দেশ—
তরুণ গরুড় -সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্‌ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড় !— অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে

শাখাসুপ্ত পাখিদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি উত্তরিলা তপোভূমি'পরে।
নমস্কার করি কবি শুধাইলা সঁপিয়া আসন,
'কী মহৎ দৈবকার্যে, দেব, তব মর্তে আগমন?'
নারদ কহিলা হাসি, 'করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি
আমারে কহিলা ডাকি, 'যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এসো, বোলো তারে, ওগো ভাগ্যবান্,
এ মহাসংগীতধন কাহারে করিবে তুমি দান?
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্তলোকে দিবে অমরতা?' '

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
'দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য, অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কী কহিছে স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র, ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জনগান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি মিলাইছে এক স্রোতে
সংগীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধু-পারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারি ধারে

ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে ;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তেকে করি উদ্‌ঘাটন
নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার ;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্মকোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব খেদ, সকল প্রয়াস,
জীবলোক-মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস ;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বাণ অনলের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে ; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গমপল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান— সেইমত প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত-উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস!

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ-সম
উদ্দাম-সুন্দর-গতি— সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোমনীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি
ছন্দ সেই অগ্নি-সম বাক্যেরে করিব সমর্পণ—
যাবে চলি মর্তসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্ধ্ব-পানে—
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।
মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,
তেমনি আমার ছন্দ ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।
হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে,
স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে—
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।
ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহো মোরে, কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম

ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।'

নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।'
'জানি আমি, জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা।'
কহিলা বাল্মীকি, 'তবু, নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর— ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।'
নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

এত বলি দেবদূত মিলাইল দিব্যস্বপ্ন-হেন
সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

গান্ধারীর আবেদন

দুর্যোধন

প্রণমি চরণে তাত !

ধৃতরাষ্ট্র

ওরে দুরাশয়,

অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ ?

দুর্যোধন

লভিয়াছি জয় ।

ধৃতরাষ্ট্র

এখন হয়েছ সুখী ?

দুর্যোধন

হয়েছি বিজয়ী ।

ধৃতরাষ্ট্র

অখণ্ডরাজত্ব জিনি সুখ তোর কই,
রে দুর্মতি !

দুর্যোধন

সুখ চাহি নাই মহারাজ !
জয় ! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি— দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান ; সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী । পিতঃ, সুখে ছিনু, যবে

একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীবটংকারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিত না দ্বারে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃপ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি ভ্রাতৃপ্রীতিভরে
দিত অংশ তার— নিত্যনব ভোগসুখে
আছিনু নিশ্চিন্তচিত্তে অনন্ত কৌতুকে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরবকর্ণ প্রতিধ্বনিরবে।
পাণ্ডবের যশোবিম্বপ্রতিবিম্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি
মলিন কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু, পিতঃ,
আপনার সর্বতেজ করি নির্বাপিত
পাণ্ডবগৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে,
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে।
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি
বনে যায় চলি— আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র

ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ!
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ,
সে কি ভুলে গেলি?

দুর্যোধন

ভুলিতে পারি নে সে যে,
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হত দূরবর্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ ; শর্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে,
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব-উদয়শিখরে
দুই ভ্রাতৃসূর্যালোক কিছুতে না ধরে।
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে— আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র

ক্ষুদ্র ঈর্ষা ! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী !

দুর্যোধন

ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান— লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্রবন্ধনে—
এক সূর্য, এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল— আজি কুরুসূর্য একা,
আজি আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র

আজি ধর্ম পরাজিত।

দুর্যোধন

লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ!
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায়সুহৃদ্‌রূপে নির্ভরবন্ধন—
কিন্তু রাজা একেশ্বর; সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্র জনে
বলভাগ ক'রে লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী; রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন-'পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার?
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই—
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি—

সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি
পাণ্ডবগৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

ধৃতরাষ্ট্র

জিনিয়া কপট দ্যূতে তারে কোস্ জয়?
লজ্জাহীন অহংকারী!

দুর্যোধন

যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখে দন্তে নহিকো সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে, জয়লাভ এক লক্ষ্য তার—
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার।

ধৃতরাষ্ট্র

আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে।

দুর্যোধন

নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি

মোর পাদপীঠতলে। 'দুর্যোধন পাপী'
'দুর্যোধন ক্রূরমনা' 'দুর্যোধন হীন'
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন—
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ,
আপামর জনে আমি কহাইব আজ,
'দুর্যোধন রাজা। দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজহস্তে নিজনাম।'

ধৃতরাষ্ট্র

ওরে বৎস, শোন্,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দাসর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

দুর্যোধন

অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়;

ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি— কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ! প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন—
সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডবভ্রাতারে;
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য; আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি। শুন নিবেদন
পিতৃদেব!— এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে
কণ্টকতরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্যগুণগান,
আমাদের নিত্য নিন্দা— এইমতে, পিতঃ,
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চিরনির্বাসিত।
এইমতে, পিতঃ, মোরা শিশুকাল হতে
হীনবল— উৎসমুখে পিতৃস্নেহস্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত— পাণ্ডবেরা স্ফীত,
অখণ্ড, অবাধগতি। অদ্য হতে, পিতঃ,
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর

ভীষ্মপিতামহে— যদি তারা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু-উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব, নাহি কাজ
সিংহাসনকণ্টকশয়নে— মহারাজ,
বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে,
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে।

ধৃতরাষ্ট্র

হায় বৎস, অভিমানী! পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য, হইত কল্যাণ।
অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে—
তবু, পুত্র, দোষ দিস স্নেহ নাই ব'লে?
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি। অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন— তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে

চলিয়াছি— বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ্র-সবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার, পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ, আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ়করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে— শুধু তুমি আর আমি,
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের। সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে; বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে, আসিবে সময়—
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
আলিঙ্গন কোরো না শিথিল; ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন;
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।— ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে—
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা -ভয়,

কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম— শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

চরের প্রবেশ

চর

মহারাজ, অগ্নিহোত্র দেব-উপাসনা
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া ; পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব ; সন্ধ্যা হল, তবু
ভৈরবমন্দির-মাঝে নাহি বাজে প্রভু,
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে ;
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার-পানে
দীনবেশে সজলনয়নে।

দুর্যোধন

নাহি জানে
জাগিয়াছে দুর্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন!
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্ধা— নির্বিষ সর্পের

ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী

মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র

রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্যোধন

পিতঃ, আমি চলিলাম তবে।

[প্রস্থান

ধৃতরাষ্ট্র

করো পলায়ন। হায়, কেমনে বা সবে
সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত! মোরে তোর নাহি লাজ।

গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী

নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা করো নাথ!

ধৃতরাষ্ট্র

কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা?

গান্ধারী

ত্যাগ করো এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র

কারে হে মহিষী ?

গান্ধারী

পাপের সংঘর্ষে যার

পড়িছে ভীষণ শান ধর্মের কৃপাণে

সেই মূঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র

কে সে জন ? আছে কোন্‌খানে ?

শুধু কহো নাম তার।

গান্ধারী

পুত্র দুর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র

তাহারে করিব ত্যাগ !

গান্ধারী

এই নিবেদন

তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র

দারুণ প্রার্থনা হে গান্ধারী,

রাজমাতা !

গান্ধারী

এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি

হে কৌরব ? কুরুকুলপিতৃপিতামহ

স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ! ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে—
কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন।

ধৃতরাষ্ট্র

ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে— আমি পিতা—

গান্ধারী

মাতা আমি নাহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেইমত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে— লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ? তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।

ধৃতরাষ্ট্র

কী রাখিব তারে ত্যাগ করি?

গান্ধারী

ধর্ম তব।

ধৃতরাষ্ট্র

কী দিবে তোমারে ধর্ম ?

গান্ধারী

দুঃখ নব নব।

পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া।

ধৃতরাষ্ট্র

হায় প্রিয়ে,

ধর্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর, 'কী করিলি ওরে ?
এককালে ধর্মাধর্ম দুই তরী-'পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে ;
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্বল দ্বিধায় পড়ি ? অপমানক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর
পাণ্ডবের মনে— শুধু নব কাষ্ঠভার
হুতাশনে দান। অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।

সক্ষমে দিয়ো না ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া,
করহ দলন। কোরো না বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত ; যদি ডেকে আন তারে
বরণ করিয়া তবে লহো একেবারে।'
এইমত পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহ রূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণসূচিসম। পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে ; দ্যূতছলনায়
বিসর্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম,
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ ! কে বুঝিবে মর্ম
সংসারের !

গান্ধারী

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু—
ধর্মেই ধর্মের শেষ। মূঢ় নারী আমি,
ধর্মকথা তোমারে কী বুঝাইব স্বামী,
জান তো সকলি। পাণ্ডবেরা যাবে বনে,
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে ;
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি— পুত্রে তব ত্যজ এইবার ;
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না ; ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ
পৌরবপ্রাসাদ হতে— দুঃখ সুদুঃসহ

আজ হতে ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,
দেহো তুলি মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র

হায় মহারানী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী!

গান্ধারী

অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র; স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।

ধৃতরাষ্ট্র

ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য— অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

গান্ধারী

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ
বিধাতার বাম হস্ত; ধর্মরক্ষা-কাজ

তোমা-'পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে,
যদি কোনো প্রজা তব সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে— কী তাহার করিবে বিধান ?

ধৃতরাষ্ট্র

নির্বাসন।

গান্ধারী

তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু! তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ— ভালোমন্দ
নাহি বুঝি তার। দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত, পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশলে হানে— মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল,
যে সেথা সঞ্চার করে ঈর্ষার গরল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে, পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী

গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ-'পরে
কলুষপরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ— পতি-সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।
মহারাজ, কী তার বিধান? অকলুষ
কুরুবংশে পাপ যদি জন্ম লাভ করে
সেও সহে, কিন্তু প্রভু, মাতৃগর্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে— হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
প্রাসাদপাষাণভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্রপিশাচেরা— ধর্ম জানে,
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব। কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত
তোমরা হে মহারথী, জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে,
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি— কোষ-মাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্রনিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ-সমান

নিদ্রাগত। মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি— দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র

পরিতাপদহনে-জর্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী!

গান্ধারী

শতগুণ বেদনা কি, নাথ,
লাগিছে না মোরে? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না।
যে তোমার পুত্র নহে তারও পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক! শুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা— পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে—

নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র। পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে ;
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপী দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র

প্রিয়ে, সংহর সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি— আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ততরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে— অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধফল ভোগ করি তার দুর্মতির,

সেই তো সান্ত্বনা মোর— এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ— ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

[প্রস্থান

গান্ধারী

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু— জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেইমত কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্‌ তার পথতলে।

ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্তশতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্‌ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার— তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস লুটি অবনতশিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক্‌ নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি! নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম!
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি,
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি!

দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতীর প্রবেশ

ভানুমতী

দাসীগণের প্রতি

ইন্দুমুখি, পরভৃতে, লহো তুলি শিরে
মাল্যবস্ত্র অলংকার।

গান্ধারী

বৎসে, ধীরে, ধীরে!
পৌরবভবনে কোন্‌ মহোৎসব আজি?

কোথা যাও নববস্ত্র-অলংকারে সাজি
বধূ মোর ?

ভানুমতী

শত্রুপরাভবশুভক্ষণ
সমাগত।

গান্ধারী

শত্রু যার আত্মীয়স্বজন
আত্মা তার নিত্য শত্রু, ধর্ম শত্রু তার,
অজেয় তাহার শত্রু। নব অলংকার
কোথা হতে হে কল্যাণী ?

ভানুমতী

জিনি বসুমতী
ভুজবলে পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলংকার—
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য-অহংকার
ঠিকরিত মাণিক্যের শতসূচিমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে, বিদ্ধ হত বুকে
কুরুকুলকামিনীর, সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে।

গান্ধারী

হা রে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার !
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহংকার !
একি ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ !
যুগান্তের উল্কা-সম দহিছে না আজ

এ মণিমঞ্জীর তোরে ? রত্নললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে, চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাণ্ডবঝংকার

ভানুমতী

মাতঃ, মোরা ক্ষত্রনারী, দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি। কভু জয়, কভু পরাজয়—
মধ্যাহ্নগগনে কভু, কভু অস্তধামে
ক্ষত্রিয়মহিমাসূর্য উঠে আর নামে।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা, মাতঃ, সেই কথা স্মরি
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ডরি
ক্ষণকাল। দুর্দিন-দুর্যোগ যদি আসে
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী,
কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

গান্ধারী

বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে। লয়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীররক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি— রত্ন-অলংকার

বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতাকুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো
ঝঞ্ঝাবাতে। বৎসে, ভাঙিয়ো না বদ্ধ সেতু।
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিও না বিপ্লবের কেতু
গৃহমাঝে। আনন্দের দিন নহে আজি।
স্বজনদুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব করিয়ো না মাতঃ। হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
করো আচরণ— বেণী করি উন্মোচন
শান্তমনে করো, বৎসে, দেবতা-অর্চন।
এ পাপ সৌভাগ্যদিনে গর্ব-অহংকারে
প্রতি ক্ষণে লজ্জা দিয়ো নাকো বিধাতারে।
খুলে ফেলো অলংকার, নবরক্তাম্বর;
থামাও উৎসববাদ্য, রাজ-আড়ম্বর,
অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে—
কালের প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব চিতে।

[ভানুমতীর প্রস্থান

দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির

আশীর্বাদ মাগিবারে এসেছি জননী,
বিদায়ের কালে।

গান্ধারী

সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল

উদিবে হে বৎসগণ। বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্যমাঝে গুপ্ত থাকি দীনছদ্মরূপে
ফিরুন পশ্চাতে তব সদা চুপে চুপে,
দুঃখ হতে তোমা-তরে করুন সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ। নিত্য হউক নির্ভয়
নির্বাসনবাস। বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জ্বলন্ত তেজ করুক সংযোগ
বহ্নিশিখাদগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের প্রায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের। সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্মরাজ বিধি; যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ তখন জগতে
দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে!
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ,
পুত্রাধিক পুত্রগণ। অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।

দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন-পূর্বক

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশী! একবার
তোলো শির, বাক্য মোর করো অবধান।
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান

জগতে রহিবে নিত্য, কলঙ্ক অক্ষয়।
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ করে লইয়াছে সর্ব কুলাঙ্গনা—
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা।
যাও বৎসে, পতি-সাথে অমলিনমুখ
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি সতীত্বের লভো সার্থকতা।
রাজগৃহে আয়োজন দিবসযামিনী
সহস্র সুখের— বনে তুমি একাকিনী
সর্বসুখ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বর্যময়,
সকল সান্ত্বনা একা, সকল আশ্রয়—
ক্লান্তির আরাম, শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা
উষা মূর্তিমতী। তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শত দলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।

[৭ মাঘ ১৩০৪]

সতী

মিস্ ম্যানিং -সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান
অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে
অ্যাক্‌ওয়ার্থ সাহেব -রচিত প্রবন্ধ-বিশেষ হইতে
বর্ণিত ঘটনা সংগহীত

রণক্ষেত্র

অমাবাই ও বিনায়ক রাও

অমাবাই

পিতা!

বিনায়ক রাও

পিতা! আমি তোর পিতা! পাপীয়সী
স্বাতন্ত্র্যচারিণী! যবনের গৃহে পশি
ম্লেচ্ছগলে দিলি মালা কুলকলঙ্কিনী!
আমি তোর পিতা!

অমাবাই

অন্যায় সমরে জিনি
স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার
অশ্রুপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ

রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষপঞ্জরে।
তুমি পিতা, আমি কন্যা— বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে
দারুণ নিশীথে। পিতঃ, প্রণমি চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়।
আজ যদি নাহি পারো ক্ষমিতে কন্যায়,
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব!

বিনায়ক রাও

কোথা যাবি অমা!
ধিক্ অশ্রুজল! ওরে দুর্ভাগিনী নারী,
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি
সে তো বজ্রাহত, দগ্ধ— যাবি কার কাছে
ইহকাল পরকাল -হারা!

অমাবাই

পুত্র আছে—

বিনায়ক রাও

থাক্ পুত্র। ফিরে আর চাস নে পশ্চাতে
পাতকের ভগ্নশেষ-পানে। আজ রাতে
শোণিততর্পণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ—
যবনের গৃহে তোর নাহিক প্রবেশ
আর কভু। বল্ তবে, কোথা যাবি আজ।

অমাবাই

হে নির্দয়, আছে মৃত্যু, আছে যমরাজ,
পিতা হতে স্নেহময়, মুক্তদ্বারে যাঁর
আশ্রয় মাগিয়া কেহ ফিরে নাই আর।

বিনায়ক রাও

মৃত্যু? বৎসে, হা দুর্বৃত্তে, পরম পাবক
নির্মল উদার মৃত্যু— সকল পাতক
করে গ্রাস, সিন্ধু যথা সকল নদীর
সব পঙ্করাশি। সেই মৃত্যু সুগভীর
তোর মুক্তি গতি। কিন্তু, মৃত্যু আজ না সে,
নহে হেথা। চল্ তবে দূর তীর্থবাসে
সলজ্জ স্বজন আর সক্রোধ সমাজ
পরিহরি, বিসর্জি কলঙ্ক ভয় লাজ
জন্মভূমিধূলিতলে। সেথা গঙ্গাতীরে
নবীন নির্মল বায়ু— স্বচ্ছ পুণ্যনীরে
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, নির্জন কুটিরে
শিব শিব শিব নাম জপি শান্তমনে,
সুদূর মন্দির হতে সায়াহ্নপবনে
শুনিয়া আরতিধ্বনি, একদিন কবে
আয়ুশেষে মৃত্যু তোরে লইবে নীরবে
পতিত কুসুমে লয়ে পঙ্ক ধুয়ে তার
গঙ্গা যথা দেয় তারে পূজা-উপহার
সাগরের পদে।

অমাবাই

পুত্র মোর—

বিনায়ক রাও

তার কথা
দূর কর্‌। অতীতনির্মুক্ত পবিত্রতা
ধৌত করে দিক তোরে। সদ্যশিশুসম
আরবার আয় বৎসে, পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতিমাতার গর্ভ হতে। নব দেশে,
নব তরঙ্গিণীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটিরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যার কল্যাণকরে।

অমাবাই

জলে পতিশোক,
বিশ্ব হেরি ছায়াসম ; তোমাদের কথা
দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফুটতা,
পশে না হৃদয়মাঝে। ছেড়ে দাও মোরে,
ছেড়ে দাও! পতিরক্তসিক্ত স্নেহডোরে
বেঁধো না আমায়।

বিনায়ক রাও

কন্যা নহেক পিতার।
শাখাচ্যুত পুষ্প শাখে ফিরে নাকো আর।
কিন্তু রে শুধাই তোরে কারে কোস পতি
লজ্জাহীনা? কাড়ি নিল যে ম্লেচ্ছ দুর্মতি

জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে
বিবাহের রাত্রে তোরে, বঞ্চিয়া কপোতে
শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোতবধূরে
আপনার ম্লেচ্ছ নীড়ে, সে দুষ্ট দস্যুরে
পতি কোস তুই! সে রাত্রি কি মনে পড়ে?
বিবাহ সভায় সবে উৎসুক অন্তরে
বসে আছি— শুভলগ্ন হল গতপ্রায়,
জীবাজি আসে না কেন সবাই শুধায়,
চায় পথপানে। দেখা দিল হেনকালে
মশালের রক্তরশ্মি নিশীথের ভালে,
শুনা গেল বাদ্যরব। হর্ষে উচ্ছ্বসিল
অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি। দুয়ারে পশিল
শতেক শিবিকা; 'কোথা জীবাজি কোথায়'
শুধাতে না শুধাতেই, ঝটিকার প্রায়
অকস্মাৎ কোলাহলে হতবুদ্ধি করি
মুহূর্তের মাঝে তোরে বলে অপহরি
কে কোথা মিলালো। ক্ষণপরে নতশিরে
জীবাজি বন্ধনমুক্ত এল ধীরে ধীরে—
শুনিনু কেমনে তারে বন্দী করি পথে
লয়ে তার দীপমালা, চড়ি তার রথে,
কাড়ি লয়ে পরি তার বরপরিচ্ছদ
বিজাপুর-যবনের রাজসভাসদ্
দস্যুবৃত্তি করি গেল। সে দারুণ রাতে
হোমাগ্নি করিয়া স্পর্শ জীবাজির সাথে

প্রতিজ্ঞা করিনু আমি, 'দস্যুরক্তপাতে
লব এর প্রতিশোধ!' বহুদিন পরে
হয়েছি সে পণ-মুক্ত। নিশীথসমরে
জীবাজি ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গতি
লভিয়াছে। রে বিধবা, সেই তোর পতি—
দস্যু সে তো ধর্মনাশী!'

অমাবাই

ধিক্ পিতা, ধিক্,
বধেছ পতিরে মোর— আরো মর্মান্তিক
এই মিথ্যা বাক্যশেল। তব ধর্ম-কাছে
পতিত হয়েছি, তবু, মম ধর্ম আছে
সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালোবাসি
শ্রদ্ধাভরে; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর, বলে করি নাই আত্মদান।
মনে আছে দুই পত্র একদিন রাতে
পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী-হাতে।
তুমি লিখেছিলে শুধু, 'হানো তারে ছুরি।'
মাতা লিখেছিল, 'পত্রে বিষ দিনু পুরি,
করো তাহা পান।' যদি বলে পরাজিত
অসহায় সতীধর্ম কেহ কেড়ে নিত
তা হলে কি এতদিন হত না পালন
তোমাদের সে আদেশ? হৃদয় অর্পণ

করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে। মাঝে মাঝে তবু
সংস্কার উঠিত জাগি; কোনোদিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণার বেগ শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুৎকম্প, অবাধ্য শরীর
সংকোচে কুঞ্চিত হত; কিন্তু তারো পরে
সতীত্ব হয়েছে জয়ী। পূর্ণভক্তিভরে
করেছি পতির পূজা; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী—
পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধী-সম।
একি, একি!
নিশীথের উল্কা-সম এ কাহারে দেখি
ছুটে আসে মুক্তকেশে?

রমাবাইয়ের প্রবেশ

জননী আমার!
কখনো যে দেখা হবে এ জনমে আর
হেন ভাবি নাই মনে। মা গো, মা-জননী,
দেহো তব পদধূলি।

রমাবাই

ছুঁস্ নে যবনী,
পাতকিনী!

অমাবাই

কোনো পাপ নাই মোর দেহে—
নির্মল তোমারি মতো।

রমাবাই

যবনের গেহে
কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম আপনার?

পতি কাছে।

রমাবাই

পতি! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার!
জানিস কাহারে বলে পতি? নষ্টমতি,
ভ্রষ্টাচার! রমণীর সে যে এক গতি,
একমাত্র ইষ্টদেব। ম্লেচ্ছ মুসলমান
ব্রাহ্মণকন্যার পতি! দেবতা-সমান!

অমাবাই

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে
পূজিয়াছি পতি বলি; মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে? নহি আমি হীনা

জননী তোমার চেয়ে— হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

রমাবাই

সতী তুমি?

অমাবাই

আমি সতী।

রমাবাই

জানিস মরিতে অসংকোচে?

অমাবাই

জানি আমি।

রমাবাই

তবে জ্বাল্ চিতানল। ওই তোর স্বামী
পড়িয়া সমরভূমে।

অমাবাই

জীবাজি!

রমাবাই

জীবাজি।
বাক্‌দত্ত পতি তোর। তারি ভস্মে আজি
ভস্ম মিলাইতে হবে। বিবাহরাত্রির
বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির
ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া;
আজি রাত্রে সে রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া
হবে সমাপন।

বিনায়ক রাও

যাও বৎসে, যাও ফিরে
তব পুত্র-কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে।
দারুণ কর্তব্য মোর নিঃশেষ করিয়া
করেছি পালন— যাও তুমি।— অয়ি প্রিয়া,
বৃথা করিতেছ ক্ষোভ, যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে
ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তরছায়ে,
সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে
অগ্নিতে দিতাম তারে ; সে যে ফলে ফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে
নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি,
সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি।
অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জীব বন্ধন
ধর্মে বাঁধিছে না তারে, বাঁধিতেছে বলে।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।— যাও বৎসে, চ'লে,
যাও তব গৃহকর্মে ফিরে ; যাও তব
স্নেহপ্রীতি-জড়িত সংসারে, অভিনব
ধর্মক্ষেত্র-মাঝে।— এসো প্রিয়ে, মোরা দোঁহে
চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে,
সংসারের দুঃখসুখ-চক্র-আবর্তন
ত্যাগ করি।

রমাবাই

তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগুলি জন্মিয়াছে। করি যাব দূর
আমার গর্ভের লজ্জা। কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গার-সম সে কলঙ্ককালি
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে,
সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে
কন্যার ভস্মের 'পরে।

অমাবাই

ছাড়ো লোকলাজ
লোকখ্যাতি— হে জননী, এ নহে সমাজ,
এ মহাশ্মশানভূমি। হেথা পুণ্যপাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ—
সত্যেরে প্রত্যক্ষ করো মৃত্যুর আলোকে।
সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে
তবু, সতী আমি। পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধো যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দোষ কন্যারে, লোকে তোরে ধন্য করে—
কিন্তু মাতঃ, নিত্যকাল অপরাধী রবে
শ্মশানের অধীশ্বর-পদে।

রমাবাই

আলো চিতা,

সৈন্যগণ। ঘেরো আসি বন্দিনীরে।

অমাবাই

পিতা!

বিনায়ক রাও

ভয় নাই, ভয় নাই। হায় বৎসে, হায়,
মাতৃহস্ত হতে আজি রক্ষিতে তোমায়
পিতারে ডাকিতে হল! যেই হস্তে তোরে
বক্ষে বেঁধে রেখেছিনু, কে জানিত ওরে,
ধর্ম্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দণ্ডিতে
সেই হস্তে একদিন হইবে খণ্ডিতে
তোমারি সৌভাগ্যসূত্র হে বৎসে আমার।

অমাবাই

পিতা!

বিনায়ক রাও

আয় বৎসে! বৃথা আচার বিচার।
পুত্রে লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্ব্বিচার বিকারবিহীন

দেবতার বৃষ্টি-সম, আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে—
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়!

রমাবাই

কোথা যাস? ফের্।
রে পাপিষ্ঠে, ঐ দেখ্, তোর লাগি প্রাণ
যে দিয়েছে রণভূমে তার প্রাণদান
নিষ্ফল হবে না— তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে, ধরি তোর মৃত্যুপূত হাতে
শূরস্বর্গ-মাঝে।—

শুন, যত আছ বীর
তোমরা সকলে ভক্ত ভৃত্য জীবাজির—
এই তাঁর বাক্‌দত্তা বধূ, চিতানলে
মিলন ঘটায়ে দাও মিলিয়া সকলে,
প্রভুকৃত্য শেষ করো।

সৈন্যগণ

ধন্য পুণ্যবতী!

অমাবাই

পিতা!

বিনায়ক রাও

ছাড়্ তোরা।

সৈন্যগণ

যিনি এ নারীর পতি

তাঁর অভিলাষ মোরা করিব পূরণ।

বিনায়ক রাও

পতি এঁর স্বধর্মী যবন।

সেনাপতি

সৈন্যগণ,

বাঁধো বৃদ্ধ বিনায়কে।

অমাবাই

মাতঃ! পাপীয়সী

পিশাচিনী!

রমাবাই

মূঢ়, তোরা কী করিস বসি?

বাজা বাদ্য, কর্ জয়ধ্বনি!

সৈন্যগণ

জয় জয়!

অমাবাই

নারকিনী!

সৈন্যগণ

জয় জয়!

রমাবাই

রটা বিশ্বময়

সতী অমা।

অম্বাবাই

জাগো জাগো, জাগো ধর্মরাজ!
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু— জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

রমাবাই

বল্‌, জয় পুণ্যময়ী!
বল্‌, জয় সতী!

সৈন্যগণ

জয় জয় পুণ্যবতী!

অম্বাবাই

পিতা! পিতা! পিতা মোর!

সৈন্যগণ

ধন্য ধন্য সতী।

২০ কার্তিক ১৩০৪

নরকবাস

নেপথ্যে

কোথা যাও মহারাজ ?

সোমক

কে ডাকে আমারে

দেবদূত ? মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে

দেখিতে না পাই কিছু, হেথা ক্ষণকাল

রাখো তব স্বর্গরথ।

নেপথ্যে

ওগো নরপাল,

নেমে এসো। নেমে এসো হে স্বর্গপথিক !

সোমক

কে তুমি, কোথায় আছ ?

নেপথ্যে

আমি সে ঋত্বিক,

মর্তে তব ছিনু পুরোহিত।

সোমক

ভগবন্‌,

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন

বাষ্প হয়ে এই মহা-অন্ধকারলোক—

সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক

নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন-মতন

নভস্তল— হেথা কেন তব আগমন !

প্রেতগণ

স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়— স্বর্গযাত্রীগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি— সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান, কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

ঋত্বিক

মহারাজ, নামো
তব দেবরথ হতে।

প্রেতগণ

ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের গন্ধ— ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি— ছয়টি ঋতুর
বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।

সোমক

গুরুদেব, প্রভো,
এ নরকে কেন তব বাস ?

ঋত্বিক

পুত্রে তব
যজ্ঞে দিয়েছিনু বলি— সে পাপে এ গতি
মহারাজ !

প্রেতগণ

কহো সে কাহিনী নরপতি—
পৃথিবীর কথা। পাতকের ইতিহাস
এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক-উল্লাস।
রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্তরাগিণীর
সকল মূর্ছনা, সুখদুঃখকাহিনীর
করুণ কম্পন। কহো তব বিবরণ
মানবভাষায়।

সোমক

হে ছায়াশরীরীগণ,
সোমক আমার নাম, বিদেহভূপতি।
বহু বর্ষ আরাধিয়া দেব দ্বিজ যতি,
বহু যাগযজ্ঞ করি, প্রাচীন বয়সে
এক পুত্র লভেছিনু— তারি স্নেহবশে
রাত্রিদিন আছিলাম আপনাবিস্মৃত।
সমস্ত-সংসার-সিন্ধু-মথিত অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি

একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে জীবন মোর ; আমার হৃদয়
ছিল তারি মুখ'পরে, সূর্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে
সেইমত রেখেছিনু তারে। সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম রাজধর্ম স্নেহপানে মোর
চাহিত সরোষ চক্ষে ; দেবী বসুন্ধরা
অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হত লজ্জামুখী।

সভামাঝে

একদা অমাত্য-সাথে ছিনু রাজকাজে,
হেনকালে অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দন
পশিল আমার কর্ণে। ত্যজি সিংহাসন
দ্রুত ছুটে চলে গেনু ফেলি সর্বকাজ।

ঋত্বিক

সে মুহূর্তে প্রবেশিনু রাজসভামাঝ
আশিস করিতে নৃপে ধান্যদূর্বাকরে
আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে
আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া,
অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জ্বলিয়া
ব্রাহ্মণের অভিমান। ক্ষণকাল-পরে
ফিরিয়া আসিলা রাজা লজ্জিত-অন্তরে।
আমি শুধালেম তাঁরে, 'কহো হে রাজন্,

কী মহা অনর্থপাত দুর্দৈবঘটন
ঘটেছিল যার লাগি ব্রাহ্মণেরে ঠেলি
অন্ধ অবজ্ঞার বশে, রাজকর্ম ফেলি,
না শুনি বিচারপ্রার্থী প্রজাদের যত
আবেদন, পররাষ্ট্র হতে সমাগত
রাজদূতগণে নাহি করি সম্ভাষণ,
সামন্ত রাজন্যগণে না দিয়া আসন,
প্রধান অমাত্য-সবে রাজ্যের বারতা
না করি জিজ্ঞাসাবাদ, না করি শিষ্টতা
অতিথি সজ্জন গুণীজনে— অসময়ে
ছুটি গেলা অন্তঃপুরে মত্তপ্রায় হয়ে
শিশুর ক্রন্দন শুনি! ধিক্ মহারাজ,
লজ্জায় আনতশির ক্ষত্রিয়সমাজ,
তব মুগ্ধ ব্যবহারে; শিশুভুজপাশে
বন্দী হয়ে আছ পড়ি দেখে সবে হাসে
শত্রুদল দেশে দেশে; নীরব সংকোচে
বন্ধুগণ সংগোপনে অশ্রুজল মোছে।'

সোমক

ব্রাহ্মণের সেই তীব্র তিরস্কার শুনি
অবাক্ হইল সভা। পাত্রমিত্রগুণী
রাজগণ প্রজাগণ রাজদূত সবে
আমার মুখের পানে চাহিল নীরবে
ভীত কৌতূহলে। রোষাবেশ ক্ষণতরে
উত্তপ্ত করিল রক্ত; মুহূর্তেক-পরে

লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত
দৃপ্ত রোষসর্পশিরে। করি প্রণিপাত
গুরুপদে, কহিলাম বিনম্র বিনয়ে,
'ভগবন্‌, শান্তি নাই এক পুত্র লয়ে,
ভয়ে ভয়ে কাটে কাল। মোহবশে তাই
অপরাধী হইয়াছি— ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
সাক্ষী থাকো মন্ত্রী-সবে, হে রাজন্যগণ,
রাজার কর্তব্য কভু করিয়া লঙ্ঘন
খর্ব করিব না আর ক্ষত্রিয়গৌরব।'

ঋত্বিক

কুণ্ঠিত আনন্দে সভা রহিল নীরব।
আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ
অন্তরে পোষণ করি, 'এক-পুত্র-শাপ
দূর করিবারে চাও, পন্থা আছে তারও—
কিন্তু সে কঠিন কাজ, পারো কি না পারো
ভয় করি।' শুনিয়া সগর্বে মহারাজ
কহিলেন, 'নাহি হেন সুকঠিন কাজ
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয়তনয়,
কহিলাম স্পর্শি তব পাদপদ্মদ্বয়।'
শুনিয়া কহিনু মৃদু হাসি, 'হে রাজন্‌,
শুন তবে। আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম করো দিয়ে আপন সন্তান।
তারি মেদগন্ধধূম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শতপুত্রবতী,

কহিনু নিশ্চয়।' শুনি নীরব নৃপতি
রহিলেন নতশিরে। সভাসুদ্ধ সকলে
উঠিল ধিক্কার দিয়া উচ্চ কোলাহলে।
কর্ণে হস্ত রুধি কহে যত বিপ্রগণ,
'ধিক্ পাপ এ প্রস্তাব।' নৃপতি তখন
কহিলেন ধীরস্বরে, 'তাই হবে প্রভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু।'
তখন নারীর আর্ত বিলাপে চৌদিক
কাঁদি উঠে; প্রজাগণ করে 'ধিক্ ধিক্';
বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল
ঘৃণাভরে। নৃপ শুধু রহিলা অটল।
জ্বলিল যজ্ঞের বহ্নি! যজনসময়ে
কেহ নাই— কে আনিবে রাজার তনয়ে
অন্তঃপুর হতে বহি! রাজভৃত্য-সবে
আজ্ঞা মানিল না কেহ। রহিল নীরবে
মন্ত্রীগণ। দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষুজল;
অস্ত্র ফেলি চলি গেল যত সৈন্যদল।
আমি ছিন্নমোহপাশ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞানী,
হৃদয়বন্ধন সব মিথ্যা বলে মানি—
প্রবেশিনু অন্তঃপুরমাঝে। মাতৃগণ
শত-শাখা-অন্তরালে ফুলের মতন
রেখেছেন অতিযত্নে বালকেরে ঘেরি
কাতর উৎকণ্ঠা-ভরে। শিশু মোরে হেরি
হাসিতে লাগিল উচ্চে দুই বাহু তুলি।

জানাইল অর্ধস্ফুট কাকলি আকুলি—
'মাতৃব্যূহ ভেদ করে নিয়ে যাও মোরে।'
বহুক্ষণ বন্দী থাকি খেলাবার তরে
ব্যগ্র তার শিশু-হিয়া। কহিলাম হাসি,
'মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি,
আয় মোর সাথে।' এত বলি বল করি
মাতৃগণ অঙ্ক হতে লইলাম হরি
সহাস্য শিশুরে। পায়ে পড়ি দেবীগণ
পথ রুধি আর্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন—
আমি চলে এনু বেগে। বহ্নি উঠে জ্বলি—
দাঁড়ায়ে রয়েছে রাজা পাষাণপুত্তলি।
কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষভরে
কলহাস্যে নৃত্য করি প্রসারিত করে
ঝাঁপাইতে চাহে শিশু। অন্তঃপুর হতে
শতকণ্ঠে উঠে আর্তস্বর। রাজপথে
অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ
নগর ছাড়িয়া। কহিলাম, 'হে রাজন্‌,
আমি করি মন্ত্রপাঠ, তুমি এরে লও,
দাও অগ্নিদেবে।'

সোমক

ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও,
কহিয়ো না আর।

প্রেতগণ

থামো থামো, ধিক্‌ ধিক্‌!

পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক,
শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি ! খুঁজে যমলোক
তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।

দেবদূত

মহারাজ, এ নরকে ক্ষণকাল যাপি
নিষ্পাপে সহিছ কেন পাপীর যন্ত্রণা ?
উঠ স্বর্গরথে— থাক্ বৃথা আলোচনা
নিদারুণ ঘটনার।

সোমক

রথ যাও লয়ে
দেবদূত ! নাহি যাব বৈকুণ্ঠ-আলয়ে।
তব সাথে মোর গতি নরকমাঝারে
হে ব্রাহ্মণ ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্র অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন।
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
নিন্দুকসমাজমাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম। সে পাপজ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ— এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।
হায় পুত্র, হায় বৎস নবনীনির্মল
করুণ কোমলকান্ত, হা মাতৃবৎসল,

একান্ত নির্ভরপর পরম দুর্বল
সরল চঞ্চল শিশু পিতৃ-অভিমানী,
অগ্নিরে খেলনা-সম পিতৃদান জানি
ধরিলি দু-হাত মেলি বিশ্বাসে নির্ভয়ে।
তার পরে কী ভর্ৎসনা ব্যথিত বিস্ময়ে
ফুটিল কাতর চক্ষে বহ্নিশিখাতলে
অকস্মাৎ। হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ অন্তরতাপ? আমি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান! দগ্ধ হব আমি
নরক-অনল-মাঝে নিত্য দিনযামী,
তবু বৎস, তোর সেই নিমেষের ব্যথা,
আচম্বিতে বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
পিতৃমুখপানে চেয়ে, পরম বিশ্বাস
চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস—
তার নাহি হবে পরিশোধ!

ধর্মের প্রবেশ

ধর্ম

মহারাজ,
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা-তরে আজ
চলো ত্বরা করি।

সোমক

সেথা মোর নাহি স্থান

ধর্মরাজ! বধিয়াছি আপন সন্তান
বিনা পাপে।

ধর্ম

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর-নরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্তপরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।

ঋত্বিক

যেয়ো না, যেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ, সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না, যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ,
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহো রহো,
মহারাজ, রহো হেথা।

সোমক

রব তব সহ

হে দুর্ভাগা! তুমি আমি মিলি অহরহ

করিব দারুণ হোম, সুদীর্ঘ যজন
বিরাট নরকহুতাশনে। ভগবন্,
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে করো মোরে যোগ—
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।

ধর্ম

মহান্ গৌরবে হেথা রহো মহীপতি!
ভালের তিলক হোক দুঃসহ দহন,
নরকাগ্নি হোক তব স্বর্ণসিংহাসন।

প্রেতগণ

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী,
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহাবৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।
বোসো আসি দীর্ঘযুগ মহাশত্রু-সনে
প্রিয়তম মিত্র-সম এক দুঃখাসনে।
অতি-উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জ্বলন্ত মেঘের সাথে দীপ্তসূর্যপ্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মুরতি—
নিত্যকাল-উদ্ভাসিত অনির্বাণজ্যোতি।

অগ্রহায়ণ ১৩০৪

কর্ণকুন্তীসংবাদ

কর্ণ

পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত,
সেই আমি— কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ।

কুন্তী

বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

কর্ণ

দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ-'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরে,
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্যডোরে
তোমা-সাথে হে অপরিচিতা!

কুন্তী

ধৈর্য ধর্
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির

আসুক নিবিড় হয়ে।— কহি তোরে বীর,
কুন্তী আমি।

কর্ণ

তুমি কুন্তী! অর্জুনজননী!

কুন্তী

অর্জুনজননী বটে, তাই মনে গণি
দ্বেষ করিয়ো না বৎস! আজও মনে পড়ে
অস্ত্রপরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে— কাহার নয়ন
তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিস্‌চুম্বন?
অর্জুনজননী সে যে! যবে কৃপ আসি
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,
কহিলেন, 'রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার'—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি

দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে
কে সে অভাগিনী? অর্জুনজননী সে যে।
পুত্র দুর্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তারে।
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক-সাথে! হেনকালে করি পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দবিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারি দিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।
ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল; সেই ক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি যে তোমারে, ওগো বীরমণি,
আশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

কর্ণ

প্রণমি তোমারে আর্যে! রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী— এ যে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী

পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ

ভিক্ষা, মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা করো দিব চরণে তোমার।

কুন্তী

এসেছি তোমারে নিতে।

কর্ণ

কোথা লবে মোরে!

কুন্তী

তৃষিত বক্ষের মাঝে— লব মাতৃক্রোড়ে।

কর্ণ

পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী—
আমি কুলশীলহীন ক্ষুদ্র নরপতি
মোরে কোথা দিবে স্থান?

কুন্তী

সর্ব-উচ্চভাগে,
তোমারে বসাব মোর সর্বপুত্র-আগে,
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি।

কর্ণ

কোন্ অধিকারমদে
প্রবেশ করিব সেথা? সাম্রাজ্যসম্পদে

বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহ ধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহো মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

কুন্তী

পুত্র মোর ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন— সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে;
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহো আপনার স্থান।

কর্ণ

শুনি স্বপ্নসম,
হে দেবী, তোমার বাণী। হেরো অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে
চেতনাপ্রত্যূষে! পুরাতন সত্য-সম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধ চিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশব কাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী,

তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে,
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথস্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়—
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
'জননী, গুণ্ঠন খোলো, দেখি তব মুখ'—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি! সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডবজননীরূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে!
হেরো দেবী, পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এ পারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুনজননীকণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর! মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া— চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে 'ভাই' বলে ধায়!

কুন্তী

তবে চলে আয়, বৎস, তবে চলে আয়।

কর্ণ

যাব, মাতঃ, চলে যাব, কিছু শুধাব না—
না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা। তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে— নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ— মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

কুন্তী

ওই পরপারে
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে।

কর্ণ

হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে! দেবী, কহো আরবার,
আমি পুত্র তব।

কুন্তী

পুত্র মোর!

কর্ণ

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে

কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে ? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে ?
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে ?
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে—
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে।— মাতঃ, নিরুত্তর ?
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু। থাক্, থাক্ তবে।
কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ
সে কথার দিয়ো না উত্তর। কহো মোরে,
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।

কুন্তী

হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম
শতখণ্ড করি। ত্যাগ করেছিনু তোরে,
সেই অভিশাপে, পঞ্চপুত্র বক্ষে করে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন— তবু হায়,
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,

খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে! বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত-দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার। আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা— যবে মুখে তোর
একটি ফুটে নি বাণী তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি; বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল,
পাপ দগ্ধ ক'রে মোরে করুক নির্মল।

কর্ণ

মাতঃ, দেহো পদধূলি, দেহো পদধূলি—
লহো অশ্রু মোর।

কুন্তী

তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে।
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান;
দূর করি দিয়া, বৎস, সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা।

কর্ণ

মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা—
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।

পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্ ; কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

কুন্তী

রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো হে বৎস, উদ্ধার।
ঢুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র— তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্নসিংহাসনে।

কর্ণ

সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ, মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি—
কুরুপতি-কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে—
তবে, ধিক্ মোরে।

কুন্তী

বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি! হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব! সেইদিন কে জানিত হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ!

কর্ণ

মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম-বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায়-লীন
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম— হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম! যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—

নামহীন, গৃহহীন— আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে—
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

১৫ ফাল্গুন ১৩০৬

কবিতাটির শেষ স্তবকে (পৃ. ৯০) একটি ছত্র 'চরম-বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন' প্রথমে ছিল না। পরে সঞ্চয়িতার প্রথম সম্পাদনা-কালে অন্ত্যানুপ্রাসের অনুরোধে কবি নূতন যোগ করিয়া দেন। অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ মুদ্রণে এ ছত্রটি সংযোজিত হইয়াছে।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

প্রথম দৃশ্য

ক্ষীরো

ধনী সুখে করে ধর্মকর্ম,
গরিবের পড়ে মাথার ঘর্ম।
তুমি রানী, আছে টাকা শত শত,
খেলাছলে করো দান ধ্যান ব্রত;
তোমার তো শুধু হুকুম মাত্র,
খাটুনি আমারি দিবসরাত্র।
তবুও তোমারি সুযশ পুণ্য,
আমার কপালে সকলই শূন্য।

নেপথ্যে

ক্ষীরি, ক্ষীরি, ক্ষীরো!

ক্ষীরো

কেন ডাকাডাকি,
নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দেব নাকি?

রানী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী

হল কী! তুই যে আছিস রেগেই।

ক্ষীরো

কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই।
কতই বা সয় রক্তমাংসে,

কত কাজ করে একটা মানুষে!
দিনে দিনে হল শরীর নষ্ট—

কল্যাণী

কেন, এত তোর কিসের কষ্ট!

ক্ষীরো

যেথা যত আছে রামী ও বামী
সকলেরই যেন গোলাম আমি।
হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দুর,
সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর।
ঘরেতে কারো তো চড়ে না অন্ন,
তোমারি ভাঁড়ারে নিমন্তন্ন।
হাড় বের হল বাসন মেজে,
সৃষ্টির পান-তামাক সেজে।
একা একা এত খেটে যে মরি,
মায়া দয়া নেই?

কল্যাণী

সে দোষ তোরি।
চাকর দাসী কি টিঁকিতে পারে
তোমার প্রখর মুখের ধারে?
লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের,
লোক গেলে শেষে আর্তনাদের
ধুম পড়ে যাবে— এর কি পথ্যি
আছে কোনোরূপ!

ক্ষীরো

সে কথা সত্যি!
সয় না আমার— তাড়াই সাধে!
অন্যায় দেখে পরাণ কাঁদে।
কোথা থেকে যত ডাকাত জোটে,
টাকাকড়ি সব দু হাতে লোটে।
আমি না তাদের তাড়াই যদি
তোমারে তাড়াত আমারে বধি।

কল্যাণী

ডাকাত মাধবী, ডাকাত মাধু,
সবাই ডাকাত, তুমিই সাধু!

ক্ষীরো

আমি সাধু! মা গো এমন মিথ্যে
মুখেও আনি নে, ভাবি নে চিত্তে।
নিই থুই খাই দু হাত ভরি,
দু বেলা তোমায় আশিস করি!
কিন্তু তবু সে দু হাত-'পরে
দু মুঠোর বেশি কতই ধরে?
ঘরে যত আন' মানুষ-জনকে
তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে।
হাত যে সৃজন করেছে বিধি
নেবার জন্যে জান তো দিদি!
পাড়াপড়শির দৃষ্টি থেকে
কিছু আপনার রাখো তো ঢেকে,

তার পরে বেশি রহিলে বাকি
চাকর-বাকর আনিয়ো ডাকি।

কল্যাণী

একা বটে তুমি! তোমার সাথি
ভাইপো ভাইঝি নাতনি নাতি—
হাট বসে গেছে সোনার চাঁদের,
দুটো করে হাত নেই কি তাঁদের!
তোর কথা শুনে কথা না সরে,
হাসি পায় ফের রাগও ধরে।

ক্ষীরো

বেশি রেগে যদি কম হাসি পেত
স্বভাব আমার শুধরিয়ে যেত।

কল্যাণী

ম'লেও যাবে না স্বভাবখানি,
নিশ্চয় জেনো।

ক্ষীরো

সে কথা মানি।
তাই তো ভরসা মরণ মোরে
নেবে না সহসা সাহস ক'রে।
ওই-যে তোমার দরজা জুড়ে
বসে গেছে যত দেশের কুঁড়ে—
কারো বা স্বামীর জোটে না খাদ্য
কারো বা বেটার মামীর শ্রাদ্ধ।
মিছে কথা ঝুড়ি ভরিয়া আনে,

নিয়ে যায় ঝুড়ি ভরিয়া দানে ;
নিতে চায় নিক, কত যে নিচ্ছে—
চোখে ধুলো দেবে সেটা কি ইচ্ছে !

কল্যাণী

কেন তুই মিছে মরিস ব'কে।
ধুলো দেয়, ধুলো লাগে না চোখে।
বুঝি আমি সব, এটাও জানি—
তারা যে গরিব, আমি যে রানী।
ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব—
আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব।
তাদের সুখ সে তারাই জানে,
আমার সুখ সে আমার প্রাণে।

ক্ষীরো

নুন খেয়ে গুণ গাহিত কভু,
দিয়ে-থুয়ে সুখ হইত তবু।
সামনে প্রণাম পদারবিন্দে
আড়ালে তোমার করে যে নিন্দে।

কল্যাণী

সামনে যা পাই তাই যথেষ্ট,
আড়ালে কী ঘটে জানেন কেষ্ট।
সে যাই হোক গে, শুধাই তোরে—
কাল বৈকালে, বল্‌ তো মোরে,
অতিথিসেবায় অনেকগুলি

কম পড়েছিল চন্দ্রপুলি—
কেন বা ছিল না রসকরা ?

ক্ষীরো

কেন করো মিছে মসকরা
দিদিঠাকরুন ! আপন হাতে
গুনে দিয়েছিনু সবার পাতে
ছুটো ছুটো ক'রে ।

কল্যাণী

আপন চোখে
দেখেছি পায় নি সকল লোকে,
খালি পাত্ত—

ক্ষীরো

ওমা ! তাই তো বলি—
কোথায় তলিয়ে যায় যে চলি
যত সামিগ্রি দিই আনিয়ে।
ভোলা ময়রার শয়তানি এ ।

কল্যাণী

এক বাটি করে দুধ বরাদ্দ,
আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য ?

ক্ষীরো

গয়লা তো নন যুধিষ্ঠির ।
যত বিষ তব কুদৃষ্টির

পড়েছে আমার পোড়া অদৃষ্টে,
যত ঝাঁটা সব আমারি পৃষ্ঠে,
হায় হায়—

কল্যাণী

ঢের হয়েছে, আর না—
রেখে দাও তব মিথ্যে কান্না।

ক্ষীরো

সত্যি কান্না কাঁদেন যাঁরা
ওই আসছেন ঝেঁটিয়ে পাড়া।

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ

প্রতিবেশিনীগণ

জয় জয় রানী, হও চিরজয়ী!
কল্যাণী তুমি কল্যাণময়ী!

ক্ষীরো

ওগো রানীদিদি, শোন্‌ ওই শোন্‌—
পাতে যদি কিছু হত অকুলোন
এত গলা ছেড়ে এত খুলে প্রাণ
উঠিত কি তবে জয়-জয় তান?
যদি দু-চারটে চন্দ্রপুলি
দৈবগতিকে দিতে না ভুলি
তা হলে কি আর রক্ষে থাকত—
হজম করতে বাপকে ডাকত।

কল্যাণী

আজ তো খাবার হয় নি কষ্ট ?

প্রথমা

কত পাতে পড়ে হয়েছে নষ্ট—
লক্ষ্মীর ঘরে খাবার ত্রুটি !

কল্যাণী

হ্যাঁ গো, কে তোমার সঙ্গে উটি ?
আগে তো দেখি নি।

দ্বিতীয়া

আমার মধু,
তারি উটি হয় নতুন বধূ—
এনেছি দেখাতে তোমার চরণে
মা জননী !

ক্ষীরো

সেটা বুঝিছি ধরণে।

দ্বিতীয়া

বধূর প্রতি

প্রণাম করিবে, এসো ইদিকে,
এই-যে তোমার রানীদিদিকে।

কল্যাণী

এসো কাছে এসো, লজ্জা কাদের ?

আংটি পরাইয়া

আহা, মুখখানি দিব্যি ছাঁদের,
চেয়ে দেখ্ ক্ষীরি!

ক্ষীরো

মুখটি তো বেশ,
তা চেয়ে তোমার আংটি সরেশ।

দ্বিতীয়া

শুধু রূপ নিয়ে কী হবে অঙ্গে!
সোনা দানা কিছু আনে নি সঙ্গে।

ক্ষীরো

যাহা এনেছিল সবি সিন্দুকে
রেখেছ যতনে, বলে নিন্দুকে।

কল্যাণী

এসো ঘরে এসো।

ক্ষীরো

যাও গো ঘরে
সোনা পাবে শুধু বানির দরে।

[কল্যাণী ও বধূ-সহ দ্বিতীয়ার প্রস্থান

প্রথমা

দেখলি মাগির কাণ্ড একি।

ক্ষীরো

কারে বাদ দিয়ে কারে বা দেখি।

তৃতীয়া

তা বলে এতটা সহ্য হয় না।

ক্ষীরো

অন্যের বউ পরলে গয়না
অন্যের তাতে জ্বলে যে অঙ্গ।

তৃতীয়া

মাসি, জান তুমি কতই রঙ্গ—
এত ঠাট্টাও আছে তোর পেটে
হাসতে হাসতে নাড়ী যায় ফেটে।

প্রথমা

কিন্তু, যা বলো, আমাদের মাতা
নাই তাঁর মতো এত বড়ো দাতা।

ক্ষীরো

অর্থাৎ কিনা, এত বড়ো হাবা
জন্ম দেয় নি আর কারো বাবা।

তৃতীয়া

সে কথা মিথ্যে নয় নিতান্ত।
দেখ্‌-না সেদিন কুশী ও ক্ষান্ত
কী ঠকানটাই ঠকালে মা গো!
আহা মাসি, তুমি সাধে কি রাগো!
আমাদেরই গায়ে হয় অসহ্য।

চতুর্থী

বুড়ো মহারাজা যে ঐশ্বর্য
রেখে গেছে সে কি এমনি ভাবে
পাঁচ ভূতে শুধু ঠকিয়ে খাবে!

প্রথমা

দেখলি তো ভাই, কানা আন্দি
কত টাকা পেলে?

তৃতীয়া

বুড়ি ঠানদি
জুড়ে দিলে তার কান্না-অস্ত্র,
নিয়ে গেল কত শীতের বস্ত্র।

চতুর্থী

বুড়ি মাগি, তার শীত কি এতই!
কাঁথা হলে চলে, নিয়ে গেল লুই!
আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে—
এ যে বাড়াবাড়ি।

প্রথমা

সে কথা যাগ্‌গে।

চতুর্থী

না না, তাই বলি, হও-নাকো দাতা,
তা বলে খাবে কি বুদ্ধির মাথা!
যত রাজ্যের দুঃখী কাঙাল,
যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙাল,
কানা খোঁড়া নুলো যে আসে মরতে,
বাচ-বিচার কি হবে না করতে!

তৃতীয়া

দেখ্‌ না ভাই, সে গোপালের মাকে

দু টাকা দিলেই পেয়ে প'য়ে থাকে—
পাঁচ টাকা তার মাসে বরাদ্দ,
এ যে মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ।

চতুর্থী

আসল কথা কি, ভালো নয় থাকা
মেয়েমানুষের এতগুলো টাকা!

তৃতীয়া

কত লোকে কত করে যে রটনা—

প্রথমা

সেগুলো তো সব মিথ্যে ঘটনা।

চতুর্থী

সত্যি মিথ্যে দেবতা জানে,
রটেছে তো কথা পাঁচের কানে—
সেটা যে ভালো না।

প্রথমা

যা বলিস, ভাই,
এমন মানুষ ভূভারতে নাই।
ছোটো-বড়ো-বোধ নাইকো মনে,
মিষ্টি কথাটি সবার সনে।

ক্ষীরো

টাকা যদি পাই বাক্স ভ'রে
আমার গলাও গলাবে তোরে।
'বাপু' বললেই মিলবে স্বর্গ,

'বাছা' বললেই বলবি 'ধন্য গো'।
মনে ঠিক জেনো, আসল মিষ্টি
কথার সঙ্গে রুপোর বৃষ্টি।

চতুর্থী

তাও বলি বাপু, এটা কিছু বেশি—
সবার সঙ্গে এত মেশামেশি।
বড়ো লোক তুমি ভাগ্যিমন্ত,
সেইমত চাই চাল-চলন তো?

তৃতীয়া

দেখলি, সেদিন শশীর বাঁ গালে
আপনার হাতে ওষুধ লাগালে!

চতুর্থী

বিধু খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর,
তারে কেন এত যত্ন আদর!

তৃতীয়া

কত লোক আছে, কেদারের মাকে
কেন বলো দেখি দিনরাত ডাকে।
গয়লাপাড়ার কেষ্টদাসী
তারি সাথে কত গল্প হাসি—
যেন সে কতই বন্ধু পুরোনো।

চতুর্থী

ওগুলো লোকের আদর কুড়োনো।

তৃতীয়া

এ সংসারের ওই তো প্রথা,
দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইকো কথা।
ভাত তুলে দেন মোদের মুখে,
নাম তুলে নেন পরম সুখে।
ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয়,
নাম চিরদিন কর্ণ জুড়োয়।

চতুর্থী

ওই বউ নিয়ে ফিরে এল নেকি।

বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ

প্রথমা

কী পেলি লো বিধু, দেখি দেখি দেখি।

দ্বিতীয়া

শুধু একজোড়া রতনচক্র।

তৃতীয়া

বিধি আজ তোরে বড়োই বক্র।
এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে,
ভেবেছিনু দেবে গয়না গা ঢেকে।

চতুর্থী

মেয়ের বিয়েতে পেয়ারি বুড়ি
পেয়েছিল হায়, তা ছাড়া চুড়ি।

দ্বিতীয়া

আমি যে গরিব নই যথেষ্ট,
গরিবিআনায় সে মাগি শ্রেষ্ঠ।
অদৃষ্টে যার নেইকো গয়না
গরিব হয়ে সে গরিব হয় না।

চতুর্থী

বড়ো মানুষের বিচার তো নেই।
কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই,
কেউ বা তাঁহার মাথার ঠাকুর।

প্রথমা

টাকাটা সিকেটা কুমড়ো কাঁকুড়
যা পাই সে ভালো, কে দেয় তাই বা?

দ্বিতীয়া

অবিচারে দান দিলেন নাই বা।
মাথা বাঁধা রেখে পায়ের নীচে
ভরি কত সোনা পেলেম মিছে।

ক্ষীরো

মালক্ষ্মী যদি হতেন সদয়
দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয়।

দ্বিতীয়া

আহা, তাই হোক, লক্ষ্মীর বরে
তোর ঘরে যেন টাকা নাহি ধরে।

প্রথমা

ওলো, থাম্ তোরা, রাখ্ বকুনি—
রানীর পায়ের শব্দ শুনি।

চতুর্থী
উচ্চৈঃস্বরে

আহা, জননীর অসীম দয়া,
ভগবতী যেন কমলালয়া।

দ্বিতীয়া

হেন নারী আর হয় নি সৃষ্টি,
সবা-'পরে তাঁর সমান দৃষ্টি।

তৃতীয়া

আহা মরি, তাঁরি হস্তে আসি।
সার্থক হল অর্থরাশি।

কল্যাণীর প্রবেশ
কল্যাণী

রাত হল, তবু কিসের কমিটি ?

ক্ষীরো

সবাই তোমার যশের জমিটি
নিড়োতেছিলেন চষতেছিলেন,
মই দিয়ে ক'ষে ঘষতেছিলেন—
আমি মাঝে মাঝে বীজ ছিটিয়ে
বুনেছি ফসল আশ মিটিয়ে।

কল্যাণী

রাত হল, আজ যাও সবে ঘরে।
এই ক'টি কথা রেখো মনে ক'রে—
আশার অন্ত নাইকো বটে,
আর-সকলেরই অন্ত ঘটে।
সবার মনের মতন ভিক্ষে
দিতে যদি হত কল্পবৃক্ষে
ঘুণ ধরে যেত— আমি তো তুচ্ছ।
নিন্দে করলে যাব না মুচ্ছো,
তবু এ কথাটা ভেবে দেখো দিখি—
ভালো কথা বলা শক্ত বেশি কি?

[প্রস্থান

চতুর্থী

কী বলছিলেম ছিল সেই খোঁজে।

ক্ষীরো

না গো না, তা নয়, এটুকু সে বোঝে—
সামনে তোমরা যেটুকু বাড়ালে
সেটুকু কমিয়ে আনবে আড়ালে।
উপকার যেন মধুর পাত্র,
হজম করতে জলে যে গাত্র—
তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি
নিন্দে-বান্দা কান্না-কাটনি।
যার খেয়ে মশা ওঠেন ফুলে
জ্বালান তারেই গোপন হুলে।

দেবতারে নিয়ে বানাবে দত্যি,
কলিকাল তবে হবে তো সত্যি।

চতুর্থী

মিথ্যে না ভাই! সামলে চলিস
যাই মুখে আসে তাই যে বলিস।
পালন যে করে সে হল মা-বাপ,
তাহারি নিন্দে সে যে মহাপাপ।
এমন লক্ষ্মী, এমন সতী
কোথা আছে হেন পুণ্যবতী?
যেমন ধনের কপাল মস্ত
তেমনি দানের দরাজ হস্ত,
যেমন রূপসী তেমনি সাধ্বী—
খুঁত ধরে তাঁর কাহার সাধ্যি!
দিস নেকো দোষ তাঁহার নামে।

তৃতীয়া

তুমি থামলে যে অনেক থামে।

দ্বিতীয়া

আহা, কোথা হতে এলেন গুরু!
হিতকথা আর কোরো না শুরু।
হঠাৎ ধর্মকথার পাঠটা
তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা।

ক্ষীরো

ধর্মও রাখো, ঝগড়াও থাক্‌,
গলা ছেড়ে আর বাজিয়ো না ঢাক।
পেট ভরে খেলে, করলে নিন্দে,
বাড়ি ফিরে গিয়ে ভজো গোবিন্দে।

[প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান

ওরে বিনি, ওরে কিনি, ওরে কাশী!

বিনি কিনি কাশীর প্রবেশ

কাশী

কেন দিদি?

কিনি

কেন খুড়ি?

বিনি

কেন মাসি?

ক্ষীরো

ওরে খাবি আয়।

বিনি

কিছু নেই খিদে।

ক্ষীরো

খেয়ে নিতে হয় পেলেই সুবিধে।

কিনি

রস্‌করা খেয়ে পেট বড়ো ভার।

ক্ষীরো

বেশি কিছু নয়, শুধু গোটা চার

ভোলা ময়রার চন্দ্রপুলি
দেখ্ দেখি ওই ঢাকনা খুলি—
তাই মুখে দিয়ে দু'বাটিখানিক
দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মীমানিক।

কাশী

কত খাব দিদি, সমস্ত দিন।

ক্ষীরো

খাবার তো নয় খিদের অধীন।
পেটের জ্বালায় কত লোকে ছোটে,
খাবার কি তার মুখে এসে জোটে?
দুঃখী গরিব কাঙাল ফতুর
চাষাভুষো মুটে অনাথ আতুর
কারো তো খিদের অভাব হয় না—
চন্দ্রপুলিটা সবার রয় না।
মনে রেখে দিস যেটার যা দর
খাবার চাইতে খিদের আদর।
হাঁ রে বিনি, তোর চিরুনি রূপোর
দেখছি নে কেন খোঁপার উপর?

বিনি

সেটা ও-পাড়ার খেতুর মেয়ে
কেঁদেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে।

ক্ষীরো

ওই রে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া।
তোমারও লেগেছে দাতার হাওয়া!

বিনি

আহা, কিছু তার নেই যে মাসি!

ক্ষীরো

তোমারি কি এত টাকার রাশি?
গরিব লোকের দয়ামায়া রোগ
সেটা যে একটা ভারি দুর্যোগ।
না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে—
হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়ীতে।
রানী যত দেয় ফুরোয় না, তাই।
দান ক'রে তার কোনো ক্ষতি নাই।
তুই যেটা দিলি রইল না তোর,
এতেও মনটা হয় না কাতর?
ওরে বোকা মেয়ে, আমি আরো তোরে
আনিয়ে নিলেম এই মনে করে
কী করে কুড়োতে হইবে ভিক্ষে
মোর কাছে তাই করবি শিক্ষে।
কে জানত, তুই পেট না ভরতে
উল্‌টো বিদ্যে শিখবি মরতে!—
দুধ যে রইল বাটির তলায়,
ওইটুকু বুঝি গলে না গলায়?
আমি মরে গেলে যত মনে আশ

কোরো দান ধ্যান আর উপবাস।
যতদিন আমি রয়েছি বর্তে
দেব.না করতে আত্মহত্যে।
খাওয়াদাওয়া হল, এখন তবে
রাত হল ঢের, শোও গে সবে।

[কিনি বিনি কাশীর প্রস্থান

কল্যাণীর প্রবেশ

ওগো দিদি, আমি বাঁচি নে তো আর—

কল্যাণী

সেটা বিশ্বাস হয় না আমার।
তবু কী হয়েছে শুনি ব্যাপারটা।

ক্ষীরো

মাইরি দিদি, এ নয়কো ঠাট্টা।
দেশ থেকে চিঠি পেয়েছি মামার,
বাঁচে কি না বাঁচে খুড়িটি আমার—
শক্ত অসুখ হয়েছে এবার,
টাকাকড়ি নেই ওষুধ দেবার।

কল্যাণী

এখনো বছর হয়নি গত,
খুড়ির শ্রাদ্ধে নিলি যে কত!

ক্ষীরো

হাঁ হাঁ. বটে বটে, মরেছে বেটি—
খুড়ি গেছে, তবু আছে তো জেঠি।

আহা রানীদিদি, ধন্য তোরে
এত রেখেছিস স্মরণ করে!
এমন বুদ্ধি আর কি আছে!
এড়ায় না কিছু তোমার কাছে।
ফাঁকি দিয়ে খুড়ি বাঁচবে আবার,
সাধ্য কি আছে সে তার বাবার!
কিন্তু, কখনো আমার সে জেঠি
মরে নি পূর্বে, মনে রেখো সেটি।

কল্যাণী

মরেও নি বটে, জন্মে নি কভু।

ক্ষীরো

এমন বুদ্ধি দিদি, তোর— তবু
সে বুদ্ধিখানি কেবলই খেলায়
অনুগত এই আমারি বেলায়?

কল্যাণী

চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাঁটা!
না বললে নয় মিথ্যে কথাটা?
ধরা পড়, তবু হও না জব্দ?

ক্ষীরো

'দাও দাও' ও তো একটা শব্দ,
ওটা কি নিত্য শোনায় মিষ্টি?
মাঝে মাঝে তাই নতুন সৃষ্টি
করতেই হয় খুড়ি-জেঠিমার।
জান তো সকলই, তবে কেন আর

লজ্জা দেওয়া ?

কল্যাণী

অমনি চেয়ে কি
পাস নি কখনো, তাই বল্ দেখি।

ক্ষীরো

মরা পাখিরেও শিকার ক'রে
তবে তো বিড়াল মুখেতে পোরে।
সহজেই পাই, তবু দিয়ে ফাঁকি
স্বভাবটাকে যে শান দিয়ে রাখি!
বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে
প্রয়োজন কালে ঠিক সে থাকে।
সত্যি বলছি, মিথ্যে কথায়
তোমারও কাছেতে ফল পাওয়া যায়।

কল্যাণী

এবার পাবে না।

ক্ষীরো

আচ্ছা, বেশ তো,
সেজন্যে আমি নইকো ব্যস্ত।
আজ না হয় তো কাল তো হবে—
ততখন মোর সবুর সবে।
গা ছুঁয়ে কিন্তু বলছি তোমার,
খুড়িটার কথা ভুলব না আর।

[কল্যাণীর হাসিয়া প্রস্থান

হরি বলো মন! পরের কাছে
আদায় করার সুখও আছে;
দুঃখও ঢের।—হে মা লক্ষ্মীটি,
তোমার বাহন পেঁচাপক্ষীটি
এত ভালোবাসে এ বাড়ির হাওয়া,
এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া,
ভুলে কোনোদিন আমার পানে
তোমারে যদি সে বহিয়া আনে—
মাথায় তাহার পরাই সিঁদুর,
জলপান দিই আশিটা ইঁদুর,
খেয়েদেয়ে শেষে পেটের ভারে
পড়ে থাকে বেটা আমারি দ্বারে—
সোনা দিয়ে ডানা বাঁধাই, তবে
ওড়বার পথ বন্ধ হবে।

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

কে আবার রাতে এসেছ জ্বালাতে,
দেশ ছেড়ে শেষে হবে কি পালাতে।
আর তো পারি নে।

লক্ষ্মী

পালাব তবে কি?
যেতে হবে দূরে।

ক্ষীরো

রোসো রোসো, দেখি।
কী পরেছ ওটা মাথার ওপর?

দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর!
হাতে কী রয়েছে সোনার বাক্সে
দেখতে পারি কি? আচ্ছা, থাক্ সে।
এত হীরে সোনা কারো তো হয় না—
ওগুলো তো নয় গিলটি গয়না?
এগুলি তো সব সাঁচ্চা পাথর?
গায়ে কী মেখেছ, কিসের আতর?
ভুর ভুর করে পদ্মগন্ধ—
মনে কত কথা হতেছে সন্ধ!
বোসো বাছা, কেন এলে এত রাতে?
আমারে তো কেউ আস নি ঠকাতে?
যদি এসে থাকো, ক্ষীরিকে তা হলে
চিনতে পারো নি সেটা রাখি ব'লে।
নাম কী তোমার বলো দেখি খাঁটি—
মাথা খাও, বোলো সত্য কথাটি।

লক্ষ্মী

একটা তো নয়, অনেক যে নাম।

ক্ষীরো

হাঁ হাঁ, থাকে বটে স্বনাম বেনাম
ব্যাবসা যাদের ছলনা করা।
কখনো কোথাও পড় নি ধরা?

লক্ষ্মী

ধরা পড়ি বটে দুই-দশ দিন,

বাঁধন কাটিয়ে আবার স্বাধীন।

ক্ষীরো

হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে—
অমন করলে হবে না সুবিধে।
নামটি তোমার বলো অকপটে।

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী।

ক্ষীরো

তেমনি চেহারাও বটে।
লক্ষ্মী তো আছে অনেকগুলি,
তুমি কোথাকার বলো তো খুলি।

লক্ষ্মী

সত্যি লক্ষ্মী একের অধিক
নাই ত্রিভুবনে।

ক্ষীরো

ঠিক ঠিক ঠিক!—
তাই বলো মা গো, তুমিই কি তিনি?
আলাপ তো নেই, চিনতে পারি নি।
চিনতেম যদি চরণজোড়া
কপাল হত কি এমন পোড়া!
এসো, বোসো, ঘর করোসে আলো।
পেঁচাদাদা মোর আছে তো ভালো?
এসেছ যখন, তখন মাত,
তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না তো।

জোগাড় করছি চরণ-সেবায়,
সহজ হস্তে পড় নি এবার—
সেয়ানা লোকেরে কয় না মায়া—
কেন যে জানি তা বিষ্ণুজায়া!
না খেয়ে মরে না বুদ্ধি থাকলে,
বোকারই বিপদ তুমি না রাখলে।

লক্ষ্মী

প্রতারণা করে পেটটি ভরাও,
ধর্মেরে তুমি কিছু না ডরাও?

কাঁয়ো

বুদ্ধি দেখলে এগোও না গো,
তোর দয়া নেই কাজেই মা গো—
বুদ্ধিমানেরা পেটের দায়
লক্ষ্মীমানেরে ঠকিয়ে খায়।

লক্ষ্মী

সরল বুদ্ধি আমার প্রিয়,
বাঁকা বুদ্ধিরে ধিক্ জানিয়ো।

কাঁয়ো

ভালে তলোয়ার যেমন বাঁকা
তেমনি বক্র বুদ্ধি পাকা।
ও জিনিস বেশি সরল হলে
নির্বুদ্ধি তো তারেই বলে।
ভালো মা গো, তুমি দয়া করো যদি

বোকা হয়ে আমি রব নিরবধি।

লক্ষ্মী

কল্যাণী তোর অমন প্রভু—
তারেও দস্যু, ঠকাও তবু!

ক্ষীরো

অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর,
যার লাগি চুরি সেই বলে চোর!
ঠকাতে হয় যে কপাল-দোষে,
তোরে ভালোবাসি বলেই তো সে।
আর ঠকাব না, আরামে ঘুমিয়ো—
আমারে ঠকিয়ে যেয়ো না তুমিও!

লক্ষ্মী

স্বভাব তোমার বড়োই রুক্ষি।

ক্ষীরো

তাহার কারণ আমি যে দুঃখী!
তুমি যদি করো রসের বৃষ্টি
স্বভাবটা হবে আপনি মিষ্টি।

লক্ষ্মী

তোরে যদি আমি করি আশ্রয়
যশ পাব কিনা সন্দেহ হয়।

ক্ষীরো

যশ না পাও তো কিসের কড়ি?
তবে তো আমার গলায় দড়ি!

দশের মুখেতে দিলেই অন্ন
দশমুখে উঠে 'ধন্য ধন্য'।

লক্ষ্মী

প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?

ক্ষীরো

একবার তুমি করো পরীক্ষে।
পেট ভরে গেলে যা থাকে বাকি
সেটা দিয়ে দিতে শক্তটা কী?
দানের গরবে যিনি গরবিনি
তিনি হোন আমি, আমি হই তিনি।
দেখবে তখন তাঁহার চালটা,
আমারি বা কত উলটো-পালটা।
দাসী আছি, জানি দাসীর যা রীতি—
রানী করো, পাব রানীর প্রকৃতি।
তাঁরও যদি হয় মোর অবস্থা
সুযশ হবে না এমন সস্তা।
তাঁর দয়াটুকু পাবে না অন্যে,
ব্যয় হবে সেটা নিজেরই জন্যে।
কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ
অনেকখানিই হবেক ধ্বংস।
দিতে গেলে কড়ি কভু না সরবে,
হাতের তেলোয় কামড়ে ধরবে।
ভিক্ষে করতে, ধরতে দু পায়
নিত্যি নতুন উঠবে উপায়।

লক্ষ্মী

তথাস্তু, রানী করে দিনু তোকে।
দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে।
কিন্তু, সদাই থেকো সাবধান,
আমার না যেন হয় অপমান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রানীবেশে ক্ষীরো ও তাহার
পারিষদবর্গ

ক্ষীরো

বিনি !

বিনি

কেন মাসি ?

ক্ষীরো

মাসি কী রে মেয়ে !
দেখি নি তো আমি বোকা তোর চেয়ে।
কাঙাল ভিখিরি কলু মালী চাষী
তারাই মাসিরে বলে শুধু 'মাসি'।
রানীর বোনঝি হয়েছ ভাগ্যে,
জান না আদব ? মালতী !

মালতী

আজ্ঞে !

ক্ষীরো

রানীর বোনঝি রানীরে কী ডাকে
শিখিয়ে দে ওই বোকা মেয়েটাকে।

মালতী

ছি ছি, শুধু মাসি বলে কি রানীকে !
রানীমাসি বলে, রেখে দিয়ো শিখে।

ক্ষীরো

মনে থাকবে তো? কোথা গেল কাশী?

কাশী

কেন রানীদিদি?

ক্ষীরো

চার-চার দাসী

নেই যে সঙ্গে?

কাশী

এত লোক মিছে

কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে!

ক্ষীরো

মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

এই মেয়েটাকে

শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে।

মালতী

তোমরা তো নও জেলেনি তাঁতিনি,

তোমরা হও যে রানীর নাতিনি

যে নবাববাড়ি এনু আমি ত্যেজি—

সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি,

তাহারি একটা ছোটো বাচ্ছার

পিছনেতে ছিল দাসী চার-চার—
তা ছাড়া সেপাই।

ক্ষীরো

শুনলি তো কাশী?

কাশী

শুনেছি।

ক্ষীরো

তা হলে ডাক্ তোর দাসী।
কিনি পোড়ামুখি!

কিনি

কেন রানীখুড়ি?

ক্ষীরো

হাই তুললেম, দিলি নে যে তুড়ি?
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

শেখাও কায়দা।

মালতী

এত বলি, তবু হয় না ফায়দা।
বেগম-সাহেব যখন হাঁচেন
তুড়ি ভুল হলে কেহ না বাঁচেন।

তখনি শূলেতে চড়িয়ে তারে
নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে।

ক্ষীরো

সোনার বাটায় পান দে তারিণী!
কোথা গেল মোর চামরধারিণী?

তারিণী

চলে গেছে ছুঁড়ি। সে বলে, 'মাইনে
চেয়ে চেয়ে তবু কিছুতে পাই নে।'

ক্ষীরো

ছোটোলোক বেটি হারামজাদি
রানীর ঘরে সে হয়েছে বাঁদি,
তবু মনে তার নেই সন্তোষ—
মাইনে পায় না ব'লে দেয় দোষ!
পিঁপড়ের পাখা কেবল মরতে।
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

মাগিরে ধরতে
পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াদা—
না না, যাবে আরো দুজন জেয়াদা।
কী বল মালতী!

মালতী

দস্তুর তাই।

ক্ষীরো

হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে আনা চাই।

তারিণী

ও পাড়ার মতি রানীমাতাজির
চরণ দেখতে হয়েছে হাজির।

ক্ষীরো

মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

নবাবের ঘরে
কোন্ কায়দায় লোকে দেখা করে?

মালতী

কুর্নিশ করে ঢোকে মাথা নুয়ে,
পিছু হটে যায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

ক্ষীরো

নিয়ে এসো সাথে, যাও তো মালতী,
কুর্নিশ করে আসে যেন মতি।

মতিকে লইয়া মালতীর পুনঃপ্রবেশ

মালতী

মাথা নিচু করো। মাটি ছোঁও হাতে,
লাগাও হাতটা নাকের ডগাতে।
তিন পা এগোও, নিচু করো মাথা।

মতি

আর তো পারি নে, ঘাড়ে হল ব্যথা।

মালতী

তিনবার নাকে লাগাও হাতটা।

মতি

টন্ টন্ করে পিঠের বাতটা।

মালতী

তিন পা এগোও, তিনবার ফের্
ধুলো তুলে নেও ডগায় নাকের।

মতি

ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ,
এর চেয়ে সিধে নাকে দেওয়া খত।
জয় রানীমার! একাদশী আজি—

ক্ষীরো

রানীর জ্যোতিষী শুনিয়েছে পাঁজি।
কবে একাদশী, কবে কোন্ বার
লোক আছে মোর তিথি গোনবার।

মতি

টাকাটা সিকেটে যদি কিছু পাই
'জয় জয়' বলে বাড়ি চলে যাই।

ক্ষীরো

যদি না'ই পাও তবু যেতে হবে,
কুর্নিশ করে চলে যাও তবে।

মতি

ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি,
তবু কড়াকড় দিতে কড়াকড়ি।

ক্ষীরো

ঘরের জিনিস ঘরেরই ঘড়ায়
চিরদিন যেন ঘরেই গড়ায়।
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

এবার মাগিরে
কুর্নিশ করে নিয়ে যাও ফিরে।

মতি

চললেম তবে—

মালতী

রোসো, ফিরো নাকো,

তিনবার মাটি তুলে নাকে মাখো।
তিন পা কেবল হটে যাও পিছু—
পোড়ো না উলটে, মাথা করো নিচু।

মতি

হায়, কোথা এনু! ভরল না পেট,
বারে বারে শুধু মাথা হল হেঁট।
আহা, কল্যাণী রানীর ঘরে
কর্ণ জুড়োয় মধুর স্বরে—
কড়ি যদি দেন অমূল্য তাই,
হেথা হীরে মোতি সেও অতি ছাই।

ক্ষীরো

সে ছাই পাবার ভরসা কোরো না।

মালতী

সাবধানে হঠো, উলটে পোড়ো না।

[মতির প্রস্থান

ক্ষীরো

বিনি!

বিনি

রানীমাসি!

ক্ষীরো

একগাছি চুড়ি
হাত থেকে তোর গেছে নাকি চুরি?

বিনি

চুরি তো যায় নি।

ক্ষীরো

গিয়েছে হারিয়ে?

বিনি

হারায় নি।

ক্ষীরো

কেউ নিয়েছে ভাঁড়িয়ে?

বিনি

না গো রানীমাসি!

ক্ষীরো

এটা তো মানিস—
পাখা নেই তার? একটা জিনিস
হয় চুরি যায়, নয় তো হারায়,
নয় মারা যায় ঠগের দ্বারায়,
তা না হলে থাকে— এ ছাড়া তাহার
কী যে হতে পারে জানি নে তো আর।

বিনি

দান করেছি সে।

ক্ষীরো

দিয়েছিস দানে?
ঠকিয়েছে কেউ, তারি হল মানে।
কে নিয়েছে বল্‌।

বিনি

মল্লিকা দাসী।

এমন গরিব নেই রানীমাসি,
ঘরে আছে তার সাত ছেলে মেয়ে—
মাস পাঁচ-ছয় মাইনে না পেয়ে
খরচপত্র পাঠাতে পারে না,
দিনে দিনে তার বেড়ে যায় দেনা,
কেঁদে কেঁদে মরে, তাই চুড়িগাছি
লুকিয়ে তাহারে দান করিয়াছি।
অনেক তো চুড়ি আছে মোর হাতে,
একখানা গেলে কী হবে তাহাতে ?

ক্ষীরো

বোকা মেয়েটার শোনো ব্যাখ্যানা।
একখানা গেলে গেল একখানা,
সে যে একেবারে ভারি নিশ্চয়।
কে না জানে যেটা রাখ সেটা রয়,
যেটা দিয়ে ফেল সেটা তো রয় না—
এর চেয়ে কথা সহজ হয় না।
অল্পস্বল্প যাদের আছে
দানে যশ পায় লোকের কাছে।
ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে,
যত দেও তত পেট বেড়ে চলে,
কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ,
ভাবে, 'আরো ঢের দিতে যে পারত'।

অতএব বাছা, হবি সাবধান,
বেশি আছে ব'লে করিস নে দান।
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

বোকা মেয়েটি এ,
এরে দুটো কথা দাও সমৃঝিয়ে।

মালতী

রানীর বোনঝি রানীর অংশ,
তফাতে থাকবে উচ্চ বংশ—
দান করা-টরা যত হয় বেশি
গরিবের সাথে তত ঘেঁষাঘেঁষি।
পুরোনো শাস্ত্রে লিখেছে শোলোক,
গরিবের মতো নেই ছোটোলোক।

ক্ষীরো

মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

মল্লিকাটারে
আর তো রাখা না!

মালতী

তাড়াব তাহারে।

ছেলেমেয়েদের দয়ার চর্চা

বেড়ে গেলে, সাথে বাড়বে খরচা।

ক্ষীরো

তাড়াবার বেলা হয়ে আন্‌মনা

বালাটা-সুদ্ধ যেন তাড়িয়ো না—

বাহিরের পথে কে বাজায় বাঁশি,

দেখে আয় মোর ছয়-ছয় দাসী

তারিণীর প্রস্থান ও

পুনঃপ্রবেশ

তারিণী

মধুদত্তর পৌত্রের বিয়ে,

ধুম করে তাই চলে পথ দিয়ে!

ক্ষীরো

রানীর বাড়ির সামনের পথে

বাজিয়ে যাচ্ছে কী নিয়ম-মতে!

বাঁশির বাজনা রানী কি সইবে!

মাথা ধরে যদি থাকত দৈবে!

যদি ঘুমোতেন, কাঁচা ঘুমে জেগে

অসুখ করত যদি রেগেমেগে!

মালতী!

মালতী

আজ্ঞে !

ক্ষীরো

নবাবের ঘরে
এমন কাণ্ড ঘটলে কী করে ?

মালতী

যার বিয়ে যায় তারে ধরে আনে—
দুই বাঁশিওয়ালা তার দুই কানে
কেবলই বাজায় ছুটো-ছুটো বাঁশি,
তিন দিন পরে দেয় তারে ফাঁসি ।

ক্ষীরো

ডেকে দাও কোথা আছে সর্দার
নিয়ে যাক দশ জুতোবর্দার—
ফি লোকের পিঠে দশ ঘা চাবুক
সপাসপ বেগে সজোরে নাবুক ।

মালতী

তবু যদি কারো চেতনা না হয়,
বন্দুক দিলে হবে নিশ্চয় ।

প্রথমা

ফাঁসি হল মাফ, বড়ো গেল বেঁচে
'জয় জয়' বলে বাড়ি যাবে নেচে ।

দ্বিতীয়া

প্রসন্ন ছিল তাদের গ্রহ,
চাবুক খাওয়া তো অনুগ্রহ।

তৃতীয়া

বলিস কী ভাই, ফাঁড়া গেল কেটে—
আহা এত দয়া রানীমার পেটে!

ক্ষীরো

থাম্ তোরা, শুনে নিজ গুণগান
লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কান।
বিনি!

বিনি

রানীমাসি!

ক্ষীরো

স্থির হয়ে রবি!
ছট্‌ফট্ করা বড়ো বেয়াদবি।
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

মেয়েরা এখনো
শেখে নি আমিরি দস্তুর কোনো।

মালতী

বিনির প্রতি

রানীর ঘরের ছেলেমেয়েদের
ছটফট করা ভারি নিন্দের।
ইতর লোকেরই ছেলেমেয়েগুলো
হেসেখুশে ছুটে করে খেলাধুলো।
রাজারানীদের পুত্রকন্যে
অধীর হয় না কিছুরই জন্যে।
হাত-পা সামলে খাড়া হয়ে থাকো,
রানীর সামনে নোড়োচোড়ো নাকো।

ক্ষীরো

ফের গোলমাল করছে কাহারা ?
দরজায় মোর নাই কি পাহারা ?

তারিণী

প্রজারা এসেছে নালিশ করতে।

ক্ষীরো

আর কি জায়গা ছিল না মরতে ?

মালতী

প্রজার নালিশ শুনবে রাজ্ঞী,
ছোটোলোকদের এত কি ভাগ্যি !

প্রথমা

তাই যদি হবে তবে অগণ্য
নোকর চাকর কিসের জন্য ?

দ্বিতীয়া

নিজের রাজ্যে রাখতে দৃষ্টি
রাজারানীদের হয় নি সৃষ্টি।

তারিণী

প্রজারা বলছে, কর্মচারী
পীড়ন তাদের করছে ভারি।
নাই দয়া মায়া, নাইকো ধর্ম,
বেচে নিতে চায় গায়ের চর্ম।
বলে তারা, 'হায়, কী করেছি পাপ—
এত ছোটো মোরা, এত বড়ো চাপ!'

ক্ষীরো

সর্ষেও ছোটো তবু সে ভোগায়,
চাপ না পেলে কি তৈল জোগায়?
টাকা জিনিসটা নয় পাকা ফল,
টুপ ক'রে খ'সে ভরে না আঁচল—
ছিঁড়ে, নাড়া দিয়ে, ঠেঙার বাড়িতে
তবে ও জিনিস হয় যে পাড়িতে।

তারিণী

সেজন্যে না মা, তোমার খাজনা
বঞ্চনা করা তাদের কাজ না।
তারা বলে, যত আমলা তোমার
মাইনে না পেয়ে হয়েছে গোঁয়ার।

লুটপাট করে মারছে প্রজা,
মাইনে পেলেই থাকবে সোজা।

ক্ষীরো

রানী বটি, তবু নইকো বোকা,
পারবে না দিতে মিথ্যে ধোঁকা—
করবেই তারা দস্যুবৃত্তি,
মাইনেটা দেওয়া মিথ্যেমিথ্যি।
প্রজাদের ঘরে ডাকাতি করে,
তা বলে করবে রানীরও ঘরে?

তারিণী

তারা বলে, রানী কল্যাণী যে।
নিজের রাজ্য দেখেন নিজে।
নালিশ শোনেন নিজের কানেই
প্রজাদের 'পরে জুলুমটা নেই।

ক্ষীরো

ছোটো মুখে বলে বড়ো কথাগুলা—
আমার সঙ্গে অন্যের তুলা?
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

কী কর্তব্য?

মালতী

জরিমানা দিক যত অসভ্য

এক-শো এক-শো !

ক্ষীরো

গরিব ওরা যে,

তাই একেবারে এক-শো'র মাঝে

নব্বই টাকা করে দিনু মাপ।

প্রথমা

আহা, গরিবের তুমিই মা-বাপ।

দ্বিতীয়া

কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে,

নব্বই টাকা পেল হাতে হাতে।

তৃতীয়া

নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে

আরো ঢের টাকা নিয়ে গেল ট্যাঁকে।

হাজার টাকার ন-শো নব্বই

চোখের পলকে পেল সর্বই।

চতুর্থী

এক দমে ভাই, এত দিয়ে ফেলা

অন্য কে পারে— এ তো নয় খেলা !

ক্ষীরো

বলিস নে আর মুখের আগে,
নিজগুণ শুনে শরম লাগে,
বিনি !

বিনি

রানীমাসী !

ক্ষীরো

হঠাৎ কী হল,
ফোঁস ফোঁস করে কাঁদিস কেন লো ?
দিনরাত আমি বকে বকে খুন,
শিখলি নে কিছু কায়দা-কানুন ?
মালতী !

মালতী

আজ্ঞে !

ক্ষীরো

এই মেয়েটাকে
শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে।

মালতী

রানীর বোনঝি জগতে মান্য,
বোঝ না এ কথা অতি সামান্য—
সাধারণ যত ইতর লোকেই
সুখে হাসে, কাঁদে দুঃখশোকেই।
তোমাদেরও যদি তেমনি হবে,
বড়োলোক হয়ে হল কী তবে !

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী

মাইনে না পেলে মিথ্যে চাকরি,
বাঁধা দিয়ে এনু কানের মাকড়ি।
ধার করে খেয়ে পরের গোলামি,
এমন কখনো শুনি নি তো আমি!
মাইনে চুকিয়ে দাও— তা না হলে
ছুটি দাও, আমি ঘরেযাই চলে।

ক্ষীরো

মাইনে চুকোনো নয়কো মন্দ,
তবু ছুটিটাই মোর পছন্দ।
বড়ো ঝঞ্ঝট মাইনে বাঁটতে
হিসেব কিতেব হয় যে ঘাঁটতে।
ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর,
খুলতে হয় না খাতাপত্তর।
ছ-ছয় পেয়াদা ধরে আসি কেশ,
নিমেষ ফেলতে কর্ম-নিকেশ!
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

সাথে যাও ওর—
ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ো কাপড়-চোপড়,

ছুটি দেয় যেন দারোয়ান যত
হিন্দুস্থানি দস্তুরমত।

মালতী

বুঝেছি রানীজি!

ক্ষীরো

আচ্ছা, তা হলে
কুর্নিশ করে যাক বেটি চলে।

[কুর্নিশ করাইয়া দাসীকে বিদায়]

দাসী

দুয়ারে রানীমা, দাঁড়িয়ে আছে কে,
বড়ো লোকের ঝি মনে হয় দেখে।

ক্ষীরো

এসেছে কি হাতি কিম্বা রথে?

দাসী

মনে হল যেন হেঁটে এল পথে!

ক্ষীরো

কোথা তবে তার বড়োলোকত্ব।

দাসী

রানীর মতন মুখটি সত্য।

ক্ষীরো

মুখে বড়োলোক লেখা নাহি থাকে,
গাড়িঘোড়া দেখে চেনা যায় তাকে।

মালতীর প্রবেশ

মালতী

রানী কল্যাণী এসেছেন দ্বারে
রানীজির সাথে দেখা করিবারে।

ক্ষীরো

হেঁটে এসেছেন ?

মালতী

শুনছি তাই তো।

ক্ষীরো

তা হলে হেথায় উপায় নাই তো।
সমান আসন কে তাহারে দেয় ?
নিচু আসনটা সেও অন্যায়।
এ এক বিষম হল সমিস্যে,
মীমাংসা এর কে করে বিশ্বে !

প্রথমা

মাঝখানে রেখে রানীজির গদি
তাহার আসন দূরে রাখি যদি ?

দ্বিতীয়া

ঘুরায়ে যদি এ আসনখানি
পিছন ফিরিয়া বসেন রানী ?

তৃতীয়া

যদি বলা যায় 'ফিরে যাও আজ—
ভালো নেই আজ রানীর মেজাজ' ?

ক্ষীরো

মালতী !

মালতী

আজ্ঞে !

ক্ষীরো

কী করি উপায় ?

মালতী

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি সারা যায়
দেখাশোনা, তবে সব গোল মেটে ।

ক্ষীরো

এত বুদ্ধিও আছে তোর পেটে !
সেই ভালো । আগে দাঁড়া সার বাঁধি
আমার এক-শো-পঁচিশটে বাঁদি ।
ও হল না ঠিক— পাঁচ পাঁচ করে
দাঁড়া ভাগে ভাগে— তোরা আয় সরে—
না না, এই দিকে— না না, কাজ নেই,
সারি সারি তোরা দাঁড়া সামনেই—
না না, তা হলে যে মুখ যাবে ঢেকে,
কোনাকুনি তোরা দাঁড়া দেখি বেঁকে ।
আচ্ছা, তা হলে ধরে হাতে হাতে
খাড়া থাক্ তোরা একটু তফাতে ।
শশী, তুই সাজ্ ছত্রধারিণী,
চামরটা নিয়ে দোলাও তারিণী !
মালতী !

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

এইবার তারে
ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে।

[মালতীর প্রস্থান

কিনি, বিনি, কাশী, স্থির হয়ে থাকো—
খবর্দার কেউ নোড়োচোড়ো নাকো।
মোর দুই পাশে দাঁড়াও সকলে
দুই ভাগ করি।

কল্যাণী ও মালতীর প্রবেশ

কল্যাণী

আছ তো কুশলে?

ক্ষীরো

আমার চেষ্টা কুশলেই থাকি,
পরের চেষ্টা দেবে মোরে ফাঁকি—
এইভাবে চলে জগৎসুদ্ধ
নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ।

কল্যাণী

ভালো আছ বিনি?

বিনি

ভালোই আছি মা—

ম্লান কেন দেখি সোনার প্রতিমা ?

ক্ষীরো

বিনি, করিস নে মিছে গোলযোগ—

ঘুচল না তোর কথা-কওয়া রোগ ?

কল্যাণী

রানী, যদি কিছু না করো মনে,

কথা আছে কিছু, কব গোপনে।

ক্ষীরো

আর কোথা যাব, গোপন এই তো,

তুমি আমি ছাড়া কেহই নেই তো।

এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছু,

রানীর সঙ্গে ফেরে পিছু-পিছু।

হেথা হতে যদি করে দিই দূর

হবে না তো সেটা ঠিক দস্তুর।

কী বল মালতী ?

মালতী

আজ্ঞে, তাই তো।

দস্তুরমত চলাই চাই তো।

ক্ষীরো

সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে।

খুঁজে দেখ্ দেখি।

দাসী

এই-যে এখানে।

ক্ষীরো

ওটা নয়, সেই মুক্তো-বসানো
আর একটা আছে, সেইটেই আনো।

অন্য বাটা আনয়ন

খয়েরের দাগ লেগেছে ডালায়—
বাঁচি নে তো আর তোদের জ্বালায়।
তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা—
না না, নিয়ে আয় পান্না-দেওয়াটা।

কল্যাণী

কথাটা আমার নিই তবে ব'লে।
পাঠান বাদশা অন্যায় ছলে
রাজ্য আমার নিয়েছেন কেড়ে—

ক্ষীরো

বল কী! তা হলে গেছে ফুলবেড়ে,
গিরিধরপুর, গোপালনগর
কানাইগঞ্জ—

কল্যাণী

সব গেছে মোর।

ক্ষীরো

হাতে আছে কিছু নগদ টাকা কি?

কল্যাণী

সব নিয়ে গেছে, কিছু নেই বাকি।

ক্ষীরো

অদৃষ্টে ছিল এত দুখ তোর!
গয়না যা ছিল হীরে-মুক্তোর,
সেই বড়ো বড়ো নীলার কণ্ঠি,
কানবালা-জোড়া বেড়ে গড়নটি,
সেই-যে চুনীর পাঁচনলি হার,
হীরে-দেওয়া সিঁথি লক্ষ টাকার—
সেগুলো নিয়েছে বুঝি লুটে-পুটে?

কল্যাণী

সব নিয়ে গেছে সৈন্যেরা জুটে।

ক্ষীরো

আহা, তাই বলে, ধনজনমান
পদ্মপত্রে জলের সমান!
দামি তৈজস ছিল যা পুরোনো
চিহ্নও তার নেই বুঝি কোনো?
সে কালের সব জিনিস-পত্র—
আসাসোটাগুলো, চামর-ছত্র,
চাঁদোয়া-কানাত, গেছে বুঝি সব?
শাস্ত্রে যে বলে ধনবৈভব
তড়িৎ-সমান, মিথ্যে সে নয়।
এখন তা হলে কোথা থাকা হয়?
বাড়িটা তো আছে?

কল্যাণী

ফৌজের দল
প্রাসাদ আমার করেছে দখল।

ক্ষীরো

ওমা, ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী—
কাল ছিল রানী, আজ ভিখারিনি!
শাস্ত্রে তাই তো বলে, সব মায়া—
ধনজন তাল-বৃক্ষের ছায়া।
কী বল মালতী!

মালতী

তাই তো বটেই,
বেশি বাড় হলে পতন ঘটেই।

কল্যাণী

কিছুদিন যদি হেথায় তোমার
আশ্রয় পাই, করি উদ্ধার
আবার আমার রাজ্যখানি—
অন্য উপায় নাহিকো জানি।

ক্ষীরো

আহা, তুমি রবে আমার হেথায়—
এ তো বেশ কথা, সুখেরই কথা এ।

প্রথমা

আহা, কত দয়া!

দ্বিতীয়া

মায়ার শরীর!

তৃতীয়া

আহা, দেবী তুমি, নও পৃথিবীর।

চতুর্থী

হেথা ফেরে নাকো অধম পতিত,
আশ্রয় পায় অনাথ অতিথ।

ক্ষীরো

কিন্তু, একটা কথা আছে বোন—
বড়ো বটে মোর প্রাসাদভবন,
তেমনি যে ঢের লোকজন বেশি
কোনোমতে তারা আছে ঠেসাঠেসি।
এখানে তোমার জায়গা হবে না—
সে একটা মহা রয়েছে ভাবনা।
তবে কিছুদিন যদি ঘর ছেড়ে
বাইরে কোথাও থাকি তাঁবু গেড়ে—

প্রথমা

ওমা, সে কী কথা!

দ্বিতীয়া

তা হলে রানীমা
রবে না তোমার কষ্টের সীমা!

তৃতীয়া

যে-সে তাঁবু নয়, তবু সে তাঁবুই—
ঘর থাকতে কি ভিজবে বাবুই ?

পঞ্চমী

দয়া করে কত নাববে নাবোতে,
রানী হয়ে কিনা থাকবে তাঁবুতে !

ষষ্ঠী

তোমার সে দশা দেখলে চক্ষে
অধীনগণের বাজবে বক্ষে।

কল্যাণী

কাজ নেই রানী, সে অসুবিধায়—
আজকের তরে লইনু বিদায়।

ক্ষীরো

যাবে নিতান্ত ! কী করব ভাই !
ছুঁচ ফেলবার জায়গাটি নাই।
জিনিসপত্র লোক-লস্করে
ঠাসা আছে ঘর— কারে ফস্ ক'রে
বসতে বলি যে তার জো'টি নেই।
ভালো কথা ! শোনো, বলি গোপনেই—
গয়নাপত্র কৌশলে রাতে
দু-দশটা যাহা পেরেছ সরাতে
মোর কাছে দিলে রবে যতনেই !

কল্যাণী

কিছুই আনি নি, শুধু হেরো এই
হাতে দুটি চুড়ি, পায়েতে নূপুর!

ক্ষীরো

আজ এসো তবে, বেজেছে দুপুর—
শরীর ভালো না, তাইতে সকালে
মাথা ধরে যায় অধিক বকালে।—
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

জানে না কানাই—
স্নানের সময় বাজবে সানাই?

মালতী

বেটারে উচিত করব শাসন!

[কল্যাণীর প্রস্থান

তুলে রাখো মোর রত্ন-আসন—

ক্ষীরো

আজকের মতো হল দরবার।
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

নাম করবার

সুখ তো দেখলি?

মালতী

হেসে নাহি বাঁচি—

ব্যাঙ থেকে কেঁচে হলেন ব্যাঙাচি।

ক্ষীরো

আমি দেখো, বাছা, নাম-করা-করি,

যেখানে সেখানে টাকা-ছড়াছড়ি,

জড়ো করে দল ইতর লোকের

জাঁক-জমকের লোক-চমকের

যত রকমের ভণ্ডামি আছে

ঘেঁষি নে কখনো ভুলে তার কাছে।

প্রথমা

রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো

তেমনি ক্ষুরের মতন ধারালো।

দ্বিতীয়া

অনেক মূর্খে করে দান ধ্যান,

কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান।

তৃতীয়া

রানীর চক্ষে ধুলো দিয়ে যাবে

হেন লোক হেন ধুলো কোথা পাবে?

ক্ষীরো

থাম্ থাম্, তোরা রেখে দে বকুনি—
লজ্জা করে যে নিজগুণ শুনি।
মালতী!

মালতী

আজ্ঞে!

ক্ষীরো

ওদের গয়না
ছিল যা এমন কাহারো হয় না।
দুখানি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে,
দেখে আমি আর বাঁচি নে হেসে।
তবু মাথা যেন নুইতে চায় না,
ভিখ নেবে তবু কতই বায়না!
পথে বের হল পথের ভিখিরি,
ভুলতে পারে না তবু রানীগিরি।
নত হয় লোক বিপদে ঠেকলে,
পিত্ত জ্বলে যে দেমাক দেখলে।—
আবার কিসের শুনি কোলাহল?

মালতী

দুয়ারে এসেছে ভিক্ষুকদল—
আকাল পড়েছে, চালের বস্তা
মনের মতন হয় নি সস্তা—
তাইতে চেঁচিয়ে খাচ্ছে কানটা,
বেতটি পড়লে হবেন ঠাণ্ডা।

ক্ষীরো

রানী কল্যাণী আছেন দাতা,
মোর দ্বারে কেন হস্ত পাতা ?
বলে দে আমার পাঁড়েজি বেটাকে,
ধরে নিয়ে যাক সকল-ক'টাকে
দাতা কল্যাণী রানীর ঘরে—
সেথায় আসুক ভিক্ষে ক'রে।
সেখানে যা পাবে এখানে তাহার
আরো পাঁচ গুণ মিলবে আহার।

প্রথমা

হা হা হা, কী মজা হবেই না জানি !

দ্বিতীয়া

হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রানী !

তৃতীয়া

আমাদের রানী এতও হাসান !

চতুর্থী

দু চোখ চক্ষু-জলেতে ভাসান !

দাসীর প্রবেশ

দাসী

ঠাকরুন এক এসেছেন দ্বারে,
হুকুম পেলেই তাড়াই তাঁহারে।

ক্ষীরো

না না, ডেকে দে-না। আজ কী জন্য
মন আছে মোর বড়ো প্রসন্ন।

ঠাকুরানীর প্রবেশ

ঠাকুরানী

বিপদে পড়েছি তাই এনু চ'লে।

ক্ষীরো

সে তো জানা কথা। বিপদে না প'লে
শুধু যে আমার চাঁদমুখখানি
দেখতে আস নি, সেটা বেশ জানি।

ঠাকুরানী

চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার—

ক্ষীরো

মোর ঘরে বুঝি শোধ নেবে তার?

ঠাকুরানী

দয়া করে যদি কিছু করো দান
এ যাত্রা তবে বেঁচে যায় প্রাণ।

ক্ষীরো

তোমার যা-কিছু নিয়েছে অন্যে
দয়া চাও তুমি তাহার জন্যে!
আমার যা তুমি নিয়ে যাবে ঘরে
তার তরে দয়া আমায় কে করে?

ঠাকুরানী

ধনসুখ আছে যার ভাণ্ডারে
দানসুখে তার সুখ আরো বাড়ে।

গ্রহণ যে করে তারি হেঁটমুখ,
দুঃখের পরে ভিক্ষার দুখ।
তুমি সক্ষম, আমি নিরুপায়—
অনায়াসে পারো ঠেলিবারে পায়।
ইচ্ছা না হয় না'ই কোরো দান,
অপমানিতেরে কেন অপমান?
চলিলাম তবে, বলো দয়া করে
বাসনা পুরিবে গেলে কার ঘরে।

ক্ষীরো

রানী কল্যাণী নাম শোন নাই!
দাতা বলে তাঁর বড়ো যে বড়াই।
এইবার তুমি যাও তাঁরি ঘরে,
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এসো ভরে—
পথ না জান তো মোর লোকজন
পৌঁছিয়ে দেবে রানীর ভবন।

ঠাকুরানী

তবে তথাস্তু। যাই তাঁরি কাছে।
তাঁর ঘর মোর খুব জানা আছে।—
আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে
অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে।
এই কথা কটি করিয়ো স্মরণ—
ধনে মানুষের বাড়ে নাকো মন।
আছে বহু ধনী, আছে বহু মানী—
সবাই হয় না রানী কল্যাণী।

ক্ষীরো

যাবে যদি তবে ছেড়ে যাও মোরে
দস্তুরমত কুর্নিশ ক'রে।
মালতী! মালতী! কোথায় তারিণী!
কোথা গেল মোর চামরধারিণী—
আমার এক-শো-পঁচিশটে দাসী!
তোরা কোথা গেলি—বিনি! কিনি! কাশী!

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী

পাগল হলি কি! হয়েছে কী তোর?
এখনো যে রাত হয় নিকো ভোর—
বল দেখি কী যে কাণ্ড কল্লি!
ডাকাডাকি করে জাগালি পল্লী!

ক্ষীরো

ওমা, তাই তো গা! কী জানি কেমন
সারা রাত ধ'রে দেখেছি স্বপন।
বড়ো কুস্বপ্ন দিয়েছিল বিধি—
স্বপনটা ভেঙে বাঁচলেম দিদি!
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব—
তুমি রানী, আমি চিরদাসী তব।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪.

মূল্য ১৭·০০ টাকা